দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ২১ মার্চ ২০১৬।। ৭ চৈত্র - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

আইনের শাসন
সঙ্কটমোচনের
একমাত্র রক্ষাকবচ
— পৃঃ ১৫

দেশদ্রোহিতা ও
বিশ্বাসঘাতকতাই
এদেশে কমিউনিস্টদের
আসল পরিচয়
— পৃ : ২৯

শুধু কামদুনি বা পার্ক স্ট্রীট নয়, বাংলায় আজ যত্রতত্র ধর্ষিতা হচ্ছে নারীরা। প্রভাবশালীদের আশীর্বাদে ধর্ষণকারীরা হয়ে উঠেছে বেপরোয়া।

ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে খাগড়াগড়, সিমুলিয়া, গার্ডেনরিচ। জানান দিল পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

শুধু মালদা সীমান্ত থেকেই কয়েক কোটি জাল টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধরা পড়েছে পাচারকারীরা। রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাকেই সহজ করিডর হিসাবে বেছে নিয়েছে তারা।

ইলামবাজার, কালিয়াচকে পর পর ঘটে গেল থানা আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাটের ঘটনা। উগ্র মৌলবাদের নিঁখুত পরিকল্পনা জেনেও রাজ্য প্রশাসন নির্বিকার।

পুলিশই যেখানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সেরাজ্যে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কোথায়? এই চিত্র এই রাজ্যে এখন আখছার।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ৭ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২১ মার্চ - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

নির্বাচন কমিশনের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে না দাঁড়ায় ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

বাংলায় একমাত্র 'সাজানো' ধর্ষণ হয়। গর্ববোধ করুন। ঘাসফুলে ভোট দিন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

কংগ্রেস কমিউনিস্টরা পরিকল্পনা মাফিকই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১২

আইনের শাসনই সঙ্কট মোচনের একমাত্র রক্ষাকবচ ▯ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৫

আইনই যদি শৃঙ্খলিত হয় ▯ ভাস্কর ভট্টাচার্য ▯ ১৭

'মুসলমান' শব্দটি ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ২০

জাতীয়তাবাদ ও মানবপ্রেমের প্রতীক শ্রীরাম ঠাকুর ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ২১

ধ্যানের শ্রেণীবিভাগ ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

কানহাইয়া কুমারের শ্রীকৃষ্ণের অনাসক্তির উপদেশ ভেবে দেখা উচিত ▯ বাচি কারকারিয়া ▯ ২৭

দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই এদেশে কমিউনিস্টদের আসল পরিচয় ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ২৯

জয়চাঁদ-উর্মিচাঁদ-মীরজাফরের ভূমিকায় রাহুল গান্ধী ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ৩৫

অসহিষ্ণুতার নামে অস্থিরতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ▯ ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ ▯ ৩৭

প্রকৃত স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ▯ ৪১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন-২০১৬

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সব রাজনৈতিক দলই এখন সর্বশক্তি নিয়ে এই নির্বাচনী রণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পরিবর্তনের স্লোগান তুলে যে দল ক্ষমতায় এসেছিল, মাত্র পাঁচ বছরেই সেই পরিবর্তনের পরিবর্তন চাইছে জনগণ। অনেকেই পশ্চিমবঙ্গ 'পশ্চিমবাংলাদেশ' হয়ে যাওয়ার অশনি সংকেত লক্ষ্য করছেন। নির্বাচনের মুখে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরছেন মোহিত রায়, দেবীপ্রসাদ রায়, শিলাদিত্য ঘোষ, অম্লানকুসুম ঘোষ, দিব্যজ্যোতি চৌধুরী, বিমল প্রামাণিক প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

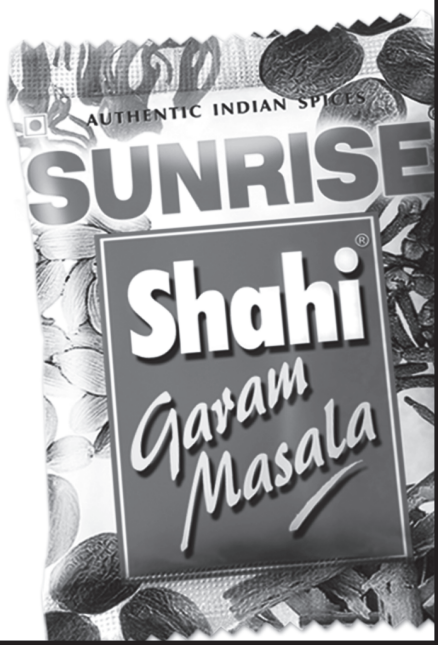

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

নতুন ভাবনার সূচনা

প্রধানমন্ত্রী হইবার পর নরেন্দ্র মোদী সামর্থ্য রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের এলপিজি সিলিন্ডারে ভরতুকি ত্যাগের আহ্বান জানাইয়া ছিলেন। আজ জানা যাইতেছে দেশের বিরাশি লক্ষ নাগরিক প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানকে সম্মান জানাইয়া স্বেচ্ছায় এলপিজি সিলিন্ডারের ভরতুকি ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ যখন দেশের সম্পদ আত্মসাৎ করিবার প্রতিযোগিতা চলিতেছে তখন কয়েক লক্ষ নাগরিক কেবল দরিদ্র সহ-নাগরিকের কথা ভাবিয়া ভরতুকি ছাড়িয়া দিতেছেন ইহা সুখের কথা এবং আশান্বিত হইবার কথা। একই সময়ে রাজস্থানে আর এস এস-এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী মন্তব্য করিয়াছেন, সমাজের বিত্তশালী অংশের সংরক্ষণের দাবি করা উচিত নয়। তাঁহারও আহ্বান, সমাজের স্বচ্ছল শ্রেণীর মানুষের উচিত নিজেদের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া দুর্বলতর অংশকে সাহায্য করা। ইহাই মনুষ্যত্ব। কিন্তু ভোটের রাজনীতি মানুষের মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বকে হরণ করিবার ফলে স্বার্থপর মানুষ আজ অনৈতিক ভাবনায় ভাবিত। উল্লেখ্য, প্রশ্ন হইতে পারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেমন পথ দেখাইবেন সমাজের মানুষও সেই পথেই চলিবে। পূর্ববর্তী সরকারের জামানায় পেট্রোলিয়াম, শিল্প, টেলিকম ইত্যাদি লইয়া বড় বড় কেলেঙ্কারি দেখিয়া মানুষ হতাশ হইয়াছিল। দেশবাসী মনে করিয়াছিল চৌর্যবৃত্তিই উন্নয়নের একমাত্র পন্থা। মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদি শব্দগুলি অর্থহীন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হইবার পর মানুষ বুঝিল সোনা আর রাঙের পার্থক্য। সততা আর ক্যারিশমা দিয়াই সকলের মন জয় করিয়া লইতেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেরলের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চণ্ডী কিংবা ত্রিপুরার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার অথবা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের পর এইবার তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু। এনডিএ শাসনের একুশ মাসে কোনো দুর্নীতি হয় নাই উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'নরেন্দ্র মোদীর এখনও কোনো বিকল্প নাই। এই সরকারের মন্ত্রীরা সৎ এবং স্বচ্ছ।' আর এই কারণেই নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে মানুষ সাড়া দিয়াছেন। তাঁহার আহ্বান ছিল, বিত্তবান যাহা ছাড়িবে, তাহা গরিবের কাজে লাগিবে। মানুষ এই আহ্বানে বিশ্বাস করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার স্বচ্ছতা ও সততায় বিরোধীদের কাছে অশনিসংকেত। কেলেঙ্কারি অনৈতিকতাই একসময় যেখানে সরকারি নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে স্বচ্ছতা ও সততা কংগ্রেসকে বিপাকে ফেলিয়াছে। তাই অসহিষ্ণুতা লইয়া চারিদিকে কংগ্রেস-সিপিএম জোটের ভাঁড়ামি চলিতেছে। সাঁইবাড়ি, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে সিপিএমের সহিষ্ণুতা কোথায় ছিল? লস্কর-ই-তৈবার ইসরত জাহানের সাহায্যে তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার চক্রান্তের সময় কংগ্রেসের সহিষ্ণুতা কোথায় ছিল। আজ যাহারা সহিষ্ণুতা লইয়া জ্ঞান বিলাইতেছেন তাহারা একবার আয়নায় নিজেদের মুখগুলি দেখিবেন কি? আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মানুষ আজ বুঝিতে শিখিয়াছে মুখ এবং মুখোশের পার্থক্য। তাই সংসদে হাজার চিৎকার করিয়াও নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তি মলিন করিতে কংগ্রেস ব্যর্থ। দেশভক্তি, জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ব লইয়া যুবসমাজ আকৃষ্ট হইতেছে। বিনামূল্যে সম্পদ বিলির আশ্বাসই জনসমর্থন পাইবার একমাত্র পন্থা নহে, ত্যাগের আহ্বানও যে জনসমর্থন পাইতে পারে তাহা দেখা যাইতেছে। ইহাই হিন্দুত্ব ইহাই ভারতীয়ত্ব। মানুষের আস্থা অর্জন করিতে পারিলে তাহাদের প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। নরেন্দ্র মোদীর সরকার দেশের কিছু সংখ্যক মানুষের আস্থা অর্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই না বিরোধীদের এত হৈচৈ চিৎকার। সততা না থাকিলে আস্থা অর্জন করা যায় না।

পুনশ্চ : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততাও কি এখন প্রশ্নের মুখে?

সুভাষিতম্

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বে স্বে চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।।
এই দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সমীপে বসে পৃথিবীর সব মানুষেরা নিজের চরিত্র গঠনের শিক্ষা গ্রহণ করুন।

হরকা বাহাদুর ক্ষতি করতে পারবে না বিজেপি-মোর্চা জোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অবশেষে পাহাড়ে আরও একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটল ড. হরকা বাহাদুর ছেত্রীর হাত ধরে। অতীতের জি এন এল এফ, অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগ (এ বি জি এল), গোর্খা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস, সিপিআরএম, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জি জে এম), ভারতীয় গোর্খা পরিষদের পর হরকা বাহাদুরের জন আন্দোলন পার্টি (জে এ পি)। বস্তুত এই নতুন দলের আত্মপ্রকাশের ফলে পাহাড়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কর্তৃত্ব কিছুটা হলেও হ্রাস হলো এবং আগামী দিনে পাহাড়ের রাজনীতিতেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু ঘটনা হলো হরকা বাহাদুর এই নতুন দল গঠন করলেও তৃণমূলের টিকিট পেয়েছেন। নতুন দলের কারণে পাহাড়ে যে রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা কতটা বাস্তবে রূপ পায় সেটাই এখন দেখার।

দার্জিলিং পাহাড়ে আশির দশকে সুভাষ ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল তা প্রায় দুই দশক ডি জি এইচ সি-এর শাসনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী হয়, কিন্তু একদা সুভাস ঘিসিংয়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী ও ডান হাত হিসেবে পরিচিত বিমল গুরুং ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্ত তামাংয়ের ফ্যান ক্লাব তৈরির মধ্য দিয়ে নিজের জনপ্রিয়তা তৈরি করে পাহাড়ে লাগু হতে যাওয়া ষষ্ঠ তফশিল-এর চূড়ান্ত বিরোধিতা করে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের সূচনা করেন। ২০০৭ সালে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে তৈরি হয় গ.জ.মো (জি জে মো)। সুভাষ ঘিসিংকে পাহাড় ছেড়ে চলে আসতে হয় জলপাইগুড়ি জেলায়। এই দলেরই কেন্দ্রীয় নেতা তথা বিধায়ক ছিলেন হরকা বাহাদুর ছেত্রী। হরকা বাহাদুর কালিম্পংয়ের নেতা ও বিধায়ক। তিনি শুধু মোর্চা ভেঙে নতুন দলই গড়ে তুললেন না বস্তুত মোর্চার অন্দরেও বড়সড় ভাঙন

হরকা বাহাদুর

ধরাতে সক্ষম হয়েছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় বিমল গুরুং তার দলের নির্বাচিত তিনজন বিধায়ককে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন, তখন তা নির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা না করেই একক প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতেই ক্ষিপ্ত হন হরকা বাহাদুর-সহ দার্জিলিংয়ের বিধায়ক ত্রিলোক দেওয়ান। ত্রিলোক দেওয়ান বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোর্চার দলীয় পদ থেকেও ইস্তফা দিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন। আর হরকা বাহাদুর বিধায়ক পদে ইস্তফা না দিয়ে মোর্চা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তাদের যুক্তি ছিল যদি রাজ্য সরকারের বিরোধিতাই করতে হয় তবে জিটিএ-এর প্রতিনিধি ও প্রশাসকেরা ইস্তফা দিলেই তা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। বিধায়কদের মেয়াদ শেষের মুখে ইস্তফা দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। যদিও মোর্চার কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক রোহিত শর্মা দলীয় সভাপতির কথা মতো বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। এর পরেই হরকা বাহাদুর নতুন দল তৈরিতে মন দেন। এতে মোর্চার বিক্ষুব্ধ নেতাদেরও তিনি পাশে পেয়ে যান।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হয়তো হরকা বাহাদুর ছেত্রীর নতুন দল জন আন্দোলন পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে মোর্চার প্রবল বিরোধিতা করবে। পাহাড়ের অন্যান্য দলগুলিও নিশ্চয় মোর্চার বিরোধিতা করার জন্য একত্রিত হয়ে লড়াই করবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে মোর্চা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করলেও পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে আবার বিজেপি-র সঙ্গে জোট করে লড়াই করে। বর্তমানে তৃণমূল যেহেতু মোর্চার প্রধান বিরোধী দল তাই মোর্চা এবার হয়তো আবারও বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধেই লড়াই করবে। যদিও কংগ্রেস ও সিপিএম উভয়দলই মোর্চার সঙ্গে জোট বাঁধতে আগ্রহী।

রাজনীতিতে নতুন দল তৈরি হওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়। এর আগেও পাহাড়ে অনেক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়নে এই রাজনৈতিক দলটির ভূমিকা কী হবে? এর আগেও আমরা দেখেছি সুভাষ ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ দুই দশক পাহাড়ের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, তাতে কিন্তু পাহাড়ের তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। পরিবর্তে ঘিসিংয়ের বিরুদ্ধে অর্থ তছরূপ ও হিসাব না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে এই কয়েক বছরের জিটিএ শাসনে কেন্দ্র সরকার কয়েকশো কোটি টাকা দিয়েছে। উন্নয়ন কিন্তু এখনো চোখে পড়েনি সেভাবে। তাই শুধু রাজনৈতিক দল গড়লেই হবে না। চাই সততা ও স্বচ্ছতা। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়কে সুইজারল্যান্ড বানাতে পারুন আর নাই পারুন, বিমল গুরুংরা পাহাড়কে গোর্খাল্যান্ড বানাতে পারুন আর নাই পারুন তাতে কিন্তু খুব বেশি কিছু ক্ষতি হয় না যদি পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব হয়। তাই আগামীদিনে পাহাড়ের রাজনীতি যে পথেই প্রভাবিত হোক না কেন পাহাড়ে যেন প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হয়।

সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের স্বার্থে স্বচ্ছলদের সংরক্ষণের সুবিধা ছেড়ে দেওয়া উচিত : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমাজের স্বচ্ছল অংশকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়াটা উচিত নয়। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে স্বচ্ছলদের উচিত সংরক্ষণের অধিকার ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এমনটা হচ্ছে না। হিন্দু সমাজই এর জন্য দায়ী। সমাজের স্বচ্ছল অংশই সংরক্ষণের দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন করছেন। তাদের এই চিন্তাধারা মোটেও সঠিক দিশায় নয়। সম্প্রতি রাজস্থানের নগৌরে অনুষ্ঠিত আর এস এসের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশী।

রাজস্থানের নগৌরে আর এস এসের প্রতিনিধিসভার বৈঠকে মোহনরাও ভাগবত ও সুরেশ যোশী।

শ্রী যোশী আরও বলেন, বি আর আম্বেদকর সামাজিক ন্যায়ের কথা ভেবেই সংরক্ষণের সুবিধা দিয়েছিলেন। আম্বেদকরের ভাবনা ও সংবিধানের প্রকৃত ভাবটিকে (স্পিরিট) স্মরণে রেখেই সংরক্ষণের দাবি করা উচিত। সমাজে বর্তমানে কাদের এই সংরক্ষণের সুবিধের দরকার রয়েছে তা পর্যালোচনা করতে এক উচ্চস্তরীয় সমীক্ষারও সুপারিশ করেন তিনি।

সব ধরনের বৈষম্যগত রীতিনীতির একেবারে মূলোৎপাটন করা দরকার। সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য সব সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলির কাজ আমাদের সুপ্রাচীন জীবনাদর্শের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। সকলের জন্য এই কাজ সহজ সাধ্য ও উচ্চমানের হওয়া দরকার। সমাজের দুর্বল অংশের বেদনা প্রত্যেকের উপলব্ধি করা দরকার। সামাজিক ন্যায় ও একাত্মতা বোধকে পুষ্ঠ করা উচিত বলে শ্রী যোশী মনে করেন।

সঙ্ঘের গণবেশে বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সঙ্ঘের গণবেশ বা ইউনিফর্মে খাকি হাফ প্যান্টের বদলে বাদামি রঙের ফুলপ্যান্ট হবে বলে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আর এস এসের সরকার্যবাহ শ্রী সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) এই ঘোষণা করে জানিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতেই এই পরিবর্তন। সঙ্ঘের এখনকার গণবেশ হলো খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা ফুলহাতা শার্ট, কালোটুপি, খয়েরি রঙের ক্যানভাসের বেল্ট, কালো বুট জুতো।

সঙ্ঘে গণবেশ পরিবর্তন এই প্রথম নয়। যদিও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ৯১ বছর পর খাকি হাফ-প্যান্টের পরিবর্তন হলো যা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার-এর সময় এই ইউনিফর্ম ছিল পুরোপুরি খাকি। এই ইউনিফর্ম পরিহিত সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার ছবিও দেখা যায়। এরপর ১৯৩০ সালে খাকি টুপির রঙ পরিবর্তন করে কালো টুপি করা হয়। বৃটিশ সরকার ইউনিফর্মের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আনার পর ১৯৪০ সালে খাকি জামা বদলে গিয়ে হয় সাদা ফুলহাতা জামা। জরুরি অবস্থার পর মিলিটারি ধাঁচের বুট পরিবর্তন করে সাধারণ কালো বুট করা হয়। এরপর ২০১১ সালে চামড়ার বেল্টের পরিবর্তে খয়েরি রঙের কাপড়ের বেল্ট করা হয়।

সংশোধনী

স্বস্তিকার গত ১৪ মার্চ ২০১৬ সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠায় উত্তর সম্পাদকীয় '১৯১৬-১৭ বাজেট' ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে। পড়তে হবে ২০১৬-১৭। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

সম্পাদক, স্বস্তিকা

লস্কর, জয়েশের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াচ্ছে ভারত-আমেরিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লস্কর-এ-তৈবা এবং জয়েশ এ মহম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির মোকাবিলায় ভারত- আমেরিকার পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়তে চলেছে। চলতি মাসের শেষে নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা শিখর বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওয়াশিংটনে পৌঁছচ্ছেন। সেখানেই বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা। গত ৮ মার্চ হোয়াইট হাউসে কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব এস জয়শঙ্কর ও মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুসান রাইস এক বৈঠকে মিলিত হন। বাণিজ্য সহযোগিতা, নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়ে দু'দেশের একযোগে কাজ করার প্রস্তাবের মাঝেই জঙ্গি মোকাবিলায় ভারত- আমেরিকার আরও কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আগামী ৩১ মার্চ ওয়াশিংটনে যে দু'দিনের নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা শিখর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাতে দু'দেশের শীর্ষনেতাদের উপস্থিতিতে বিষয়টি চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা হয় তখনই। এঁদের বৈঠকের পরে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র নেড প্রাইস এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন : 'একবিংশ শতাব্দীতে ভারত-আমেরিকার অংশীদারীত্বের মাধ্যমে তাঁদের সম্পর্ক উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রনেতারা দিয়েছেন, তা রক্ষা করতেই এই জঙ্গি ইস্যুতে দু'দেশ পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর কথা ভাবছে।'

রাইসের সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও জয়শঙ্কর তাঁর চারদিনের মার্কিন সফরে অন্যান্য উচ্চপদস্থ মার্কিন আধিকারিকদের সঙ্গেও আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও নিউক্লিয়ার শিখর সম্মেলনে ভারতের প্রস্তুতির ব্যাপারে আলোচনায় বসেন। তিনি মার্কিন বাণিজ্য সচিব পেনি প্রিটজকার, বাণিজ্য প্রতিনিধি মাইক ফ্রোম্যান, রাষ্ট্র উপ সচিব অ্যান্টনি ব্লিনকেন, দুই রাষ্ট্রীয় প্রতি-সচিব থমাস স্যানন ও রোজ গোট্রেরমোয়েল্লার প্রমুখের সঙ্গেও বৈঠক করেন। ভারতীয় দূতাবাস থেকে এ নিয়ে জারি করা এবং বিবৃতিতে বলা হয়েছে : 'আগামী বছরগুলিতে ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলিতে উভয়ের সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদেশ-সচিব পর্যায়ের এই বৈঠক আয়োজিত হয়েছে। এই মর্মে উভয়পক্ষই সহমত হয়েছে যে দু'পক্ষের সহযোগিতার কিছু মুখ্য বিষয় যেমন নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং নিউক্লিয়ার শক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে ভারত-আমেরিকা আরও কাছাকাছি আসবে।

পাকিস্তানের হাত ধরে এল ও সি-র উপর চীনের নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাক-চীন সখ্যতার হাত ধরেই ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে চাপ বাড়াচ্ছে চীন। লাদাখে বারংবার অনুপ্রবেশের পর এখন কাশ্মীরের লাইন অফ কন্ট্রোলের (এলওসি) ওপারে অর্থাৎ পাকিস্তানের দিকে কয়েক হাজার পিপল্‌স লিবারেশন আর্মির উপস্থিতি নজরে এসেছে। নওগ্রাম সেক্টরের বিপরীতে লাল ফৌজের উপস্থিতির পক্ষে সাফাই দিয়ে পাক সেনা আধিকারিকরা জানিয়েছে এলওসি বরাবর পরিকাঠামোগত নির্মাণের উদ্দেশ্যে পিএলএ-এর সেনারা ঘাঁটি গেড়েছে। যদিও সমর বিশেষজ্ঞরা এই দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে উত্তর কাশ্মীরের বন্দীপুরে ভারতের নির্মীয়মান জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কিষাণগঞ্জ পাওয়ার প্রজেক্টের পাল্টা হিসাবেই তাঙ্গধর সেক্টরের বিপরীতে চীন সরকারের নিয়ন্ত্রিত চায়না গেজহৌক গ্রুপ কোম্পানি লিপিটেড ৯৭০ মেগাওয়াট ঝিলাম নিলম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিষাণগঞ্জ পাওয়ার প্রজেক্টটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা মাত্র ৩৩০ মেগাওয়াট। এছাড়াও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে চৈনিক উদ্যোগে রাস্তা ও বাঙ্কার তৈরি করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমগুলিতে এনিয়ে খবর প্রকাশিত হলেও ভারতীয় সেনাবাহিনী এ নিয়ে নীরব থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া গেছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের লিপা উপত্যকায় সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ চলছে। এই সুড়ঙ্গটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য চীনের জিনজিয়াং থেকে কারাকোরাম হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত পথে পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরে পৌঁছানো। যাতে চীনের ভারত মহাসাগর ঘুরে পণ্য পরিবহণের খরচ কমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উপরেও চাপ বাড়ানো যায়। এছাড়া পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে চীন তিনটি নতুন ফৌজি ডিভিশন তৈরি করছে বলে খবর আছে যেখানে সব মিলিয়ে তিরিশ হাজার সৈন্য থাকবে।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইনিজ স্টাডিজের অধ্যাপক শ্রীকান্ত কোনডাপল্লী সমগ্র বিষয়টিকে চীনের 'গেম প্ল্যান' বলে অভিহিত করেছেন।

স্বস্তিকার বিশেষ সংখ্যা

বাংলায় শিশুমন্দির

স্বস্তিকার ৪ এপ্রিল, ২০১৬ সংখ্যাটি 'বাংলায় শিশুমন্দির' বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

দাম একই থাকছে - ১০ টাকা।
সত্বর কপি বুক করুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তা-বিরোধী শক্তিকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হবে : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জে এন ইউ, হায়দরাবাদ, যাদবপুরের মতো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিরোধী যে স্লোগান উঠছে, তার কঠোরভাবে মোকাবিলা করা দরকার বলে দাবি জানিয়েছে আর এস এস। গত ১১ মার্চ রাজস্থানের নাগৌরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার তিনদিন ব্যাপী বৈঠক শুরু হয়। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ শ্রীসুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বাক্-স্বাধীনতার নামে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও জাতিকে ধ্বংস করার এই স্লোগান কীভাবে সহ্য করা যাবে? আমাদের জাতীয় সংসদকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে যে দোষী, তাকে শহিদের সম্মান দেওয়াটাই বা কীভাবে সহ্য করা যাবে? এমন কাজকে জাতীয়তাবিরোধী কাজ বলেই দেখতে হবে। যারা এইরকম কাজ করে আমাদের সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, সংসদ ইত্যাদির প্রতি তাদের কোনো বিশ্বাস নেই।

তবে সুখের কথা হলো, এইসব ঘটনার কথা যখন প্রকাশ্যে এসেছে, তখন সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ হয়েছে। আমরা আশা করি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এইরকম জাতীয়তা-বিরোধী ও অসামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে মোকাবিলা করবেন এবং আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে রাজনৈতিক কাজকর্মের কেন্দ্র না হয়ে উঠে তা নিশ্চিত করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুস্থ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যাতে বজায় থাকে তা দেখবেন।

উবাচ

"যার সঙ্গে হিন্দু, ভারত বা ভারতীয় শব্দটি জুড়ে রয়েছে, তাতেই আপত্তি রয়েছে এ দেশের বিরোধীদের।"

যমুনার চরে আর্ট অব লিভিং-এর বিশ্ব সাংস্কৃতিক উৎসবে বিরোধীদের আপত্তি প্রসঙ্গে।

বেঙ্কাইয়া নায়ডু
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

"৩৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিশ্বের সব দেশকেই আপন করে নিয়েছেন রবিশঙ্কর। এতো দেখছি সংস্কৃতির কুম্ভমেলা।"

দিল্লীতে যমুনার 'আর্ট অব লিভিং'-এর অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

"মিঃ আজাদ-এর আই এস আই এস-এর সঙ্গে আর এস এসের তুলনা করা কংগ্রেসের চিন্তার দৈন্যতাই প্রকাশ করে। আই এস আই এস-এর মতো নিষ্ঠুর ও মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে কংগ্রেসের মোকাবিলা করার অনিচ্ছাটাই এতে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।"

জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ-এর সভায় গোলাম নবী আজাদ-এর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

মনমোহন বৈদ্য
প্রচার প্রমুখ,
আর এস এস

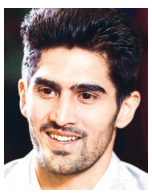

"আমার এই জয় পাঠানকোটে জঙ্গি আক্রমণে নিহত শহীদ জওয়ানদের উৎসর্গ করলাম।"

ব্রিটেনে প্রো-বক্সিং-এ টানা চতুর্থ জয়ের পর।

বিজয়েন্দ্র সিং
ভারতীয় বক্সার

"ভারতে যে ভালোবাসা পেয়েছি তা পাকিস্তানেও পাইনি।"

ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে এসে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে।

শাহিদ আফ্রিদি
পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক

নির্বাচন কমিশনের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে না দাঁড়ায়

গূঢ়পুরুষের কলম

আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার দেবেশ রায় সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধে আসন্ন বিধানসভার ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, ''কংগ্রেস ও বামপন্থীরা মৈত্রীবদ্ধ হলে অপরাজেয় শক্তি হয়ে ওঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জিতেছিলেন কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট বহির্ভূত বামপন্থীদেরই সমর্থনে। এবার কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও ফ্রন্ট বহির্ভূত বামপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে। এই বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে আমাদের কাঁচকলা হবে এবং উদ্ভট উন্নয়ন দিয়ে প্রায় প্রায় অসম্ভবের খেলা। খেলাটা যে অসম্ভবের সেটা কিন্তু তৃণমূলই সবচেয়ে বেশি করে জানান দিচ্ছে।''

দেবেশবাবুর বিশ্লেষণ একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। তবে যেটা সত্য তা হচ্ছে রোজ খবরের কাগজে পাতার পর পাতা উন্নয়নের রঙিন সরকারি বিজ্ঞাপন বেরোলেও তৃণমূল নেত্রীর সমর্থনে জনজোয়ার রাজ্যের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কোথাও ধন্য ধন্য রব উঠছে না। গত ২০১১-র বিধানসভার নির্বাচনের আগে সিপিএমের স্লোগান ছিল কৃষি আমাদের অতীত, শিল্পোন্নয়ন আমাদের ভবিষ্যৎ। পরিণামে বামপন্থীদের মুখ পুড়েছিল। ইতিহাসের কী নিদারুন পরিহাস। মমতা আজ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতোই বলছেন উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে আমরা ভোটের প্রচারে যাচ্ছি। আমরা যে কাজ করেছি তা ১০০ বছরের কাজ। আমাদের কাজ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের গবেষণা করা উচিত। মাত্র পাঁচ বছরে ১০০ বছরের কাজ কী করে করা সম্ভব। আমরা উন্নয়ন দিয়ে জোট ঘোঁটের বিরুদ্ধে লড়ব।

কংগ্রেস-বামেদের জোট ঘোঁট নিয়ে তৃণমূল কর্মীরা যতই বিদ্রুপ করে দেওয়ালে ছড়া লিখুন না কেন বাস্তব কিন্তু ভিন্ন। আসন রফা করে ৯০ শতাংশ আসনে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দিলে বহু আসনে ফলাফলের চরিত্র পাল্টে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে এই রাজ্যে তৃণমূল প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে। ভোট পর্ব শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহ আগে এমন কোনো ম্যাজিক ঘটেনি যে তৃণমূলের ভোট শতাংশ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল বিরোধী ৬০ শতাংশ ভোটের যদি বড়রকম বিভাজন না হয় তবে শাসকদের কপালে দুঃখ আছে। দক্ষিণবঙ্গ তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটির মিথ্ ভেঙে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তৃণমূল নেত্রীও সেকথা ভালই জানেন এবং বোঝেন। তিনি মুখে বলছেন, 'কাস্তে হাতুড়ি হাত পদ্ম, বাংলার মানুষ করবে জব্দ'। এখানে 'বাংলার মানুষ' কথাটার অর্থ ধরতে হবে তৃণমূলের গুণ্ডা লুম্পেনরা ভোট লুঠ করবে। নেত্রী বলছেন, আগেরবার বলেছিলাম বদল চাই। এবার বলছি বদলা চাই।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন জানে যে তৃণমূল পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভোটের দিন বাইক বাহিনী পথে নামিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র নির্বাচন কমিশনকে লাগাতার খবর দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে ভোট লুঠ-বন্ধ করার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কমিশন। এখন দেখার কমিশনের বজ্র আঁটুনি শেষ পর্যন্ত ফস্কা গেরো হয়ে না দাঁড়ায়। দুঃখের কথা হচ্ছে যে কমিশন অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলে দেশের সংবিধানে এমন কোনো ধারা নেই যাতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের কড়া শাস্তি দেওয়া যায়। অতীতে আমরা ভোটের আগে কমিশনের অনেক হুঙ্কার শুনেছি। ভোটের দিন কমিশনের প্রতিনিধিদের টিকিটিও দেখা যায়নি। বিহারে জাতপাতের অঙ্কে ভোট হয়। আর আমাদের রাজ্যে ভোট নিয়ন্ত্রণ করে পার্টির পোষা গুণ্ডারা। তারাই দাপিয়ে বেড়ায়। তারাই ভোটে জেতায়। তারাই ভোটে হারায়। মদন মিত্র জেলে বসে নির্বাচনে লড়ছেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে জেতাবেন। সারদা চিটফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে তিনি এখন জেলবন্দি। এতে নাকি তাঁর কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটদতাদের সহানুভূতি ভোটে তিনি বিপুল মার্জিনে এবার জিতছেন। অর্থাৎ, দলীয় কর্মীদের পেশি শক্তির উপরই সব সহানুভূতি ভোট নির্ভর করছে। রাজ্যজুড়ে গুণ্ডাদের দাপট রুখতে কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী কতটা তৎপর হবে তার উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের ভোট ভাগ্য। ভোট লুঠ ব্যর্থ করতে বিরোধী দলের কর্মীদেরও যথেষ্ট তৎপর হতে হবে। শুধু কমিশনের প্রতিনিধি আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর সব দায়ভার চাপালে চলবে না। মাঠে ময়দানে নেমে শাসকদলের গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে শাসকদলের হাতে পুলিশ প্রশাসন থাকলেও জনসমর্থন নেই।

রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একটা চোরা স্রোত বইছে। আইনের শাসন নেই। বাংলার সচেতন মানুষ এটা মেনে নিচ্ছে না। শুনতে অসম্ভব মনে হলেও এবার নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হলে আমি অবাক হবো না।

বাংলায় একমাত্র 'সাজানো' ধর্ষণ হয় গর্ববোধ করুন। ঘাসফুলে ভোট দিন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

সামনে ভোট। বিধানসভা ভোট। এই কটা দিন একটু সহ্য করে নেবেন আমায়। ঘন ঘন চিঠি পাঠাব আপনাদের। শুধু পড়লেই হবে না ভাবতে হবে।

দিদির আমলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কত ভাল সেটাই আজ তুলে ধরব আপনাদের কাছে। আশা করি, আপনাদের পছন্দ হবে। আর তাই আশা করব, এমন সুশাসনের নজির দেখানো দিদিকে আপনারা বারবার ভোট দিয়ে, অনেক অনেক ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনবেন।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কত ভাল বোঝাতে বিধানসভার 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' অধিবেশনে কামদুনি এবং পার্ক স্ট্রিট-কাণ্ডে অভিযুক্তদের শাস্তি পাওয়ার ঘটনাকে সরকারের 'সাফল্য' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এক সময়ে দু'টি ঘটনাকেই 'সাজানো' বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, পার্ক স্ট্রিট-কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার পর তাঁরই নির্দেশে দময়ন্তী সেনের মতো নির্ভীক পুলিশ অফিসারকে বদলি করে রাজ্য সরকার। তাঁর আমলেই এ রাজ্য নারী নির্যাতনে প্রথম স্থান দখল করেছে। এত বড় 'সাফল্য' কোনো রাজ্য দেখাতে পেরেছে?

নির্বাচনী ইস্তাহারে নিজের আমলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিজেই ঢালাও প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে মমতার দাবি--- এ রাজ্যে ধর্ষণ, রাজনৈতিক হত্যা ও জঙ্গলমহলে খুনখারাবি কমেছে। এবং কতটা কমেছে, তা বোঝাতে বাম আমলের নেতাই, নন্দীগ্রাম, নানুর ও সাঁইবাড়ি-কাণ্ডের মতো কিছু ঘটনার সঙ্গে তুলনা টেনেছেন তিনি। মমতা দাবি করেছেন--- রাজ্যে নারীদের উপরে অপরাধের ঘটনাও ক্রমশ কমছে।

কিন্তু যে এনসিআরবি-র তথ্য উদ্ধৃত করে এই দাবি তৃণমূল নেত্রীর, তাদেরই রিপোর্ট জানিয়েছিল— ২০১১-এ ক্ষমতায় আসার পরের বছর মমতার বাংলাই নারী নির্যাতনে দেশে সবার উপরে ছিল। ওই কেন্দ্রীয় সংস্থার তথ্য বলছে, ২০১১-তে এ রাজ্যে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ২৯,১৩৩টি মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১২ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০,৯৪২। নবান্নের খবর, পর পর দু'বার নারী নির্যাতনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় ক্ষুব্ধ হয়ে এনসিআরবি-কে তথ্য পাঠাতেই নিষেধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার বিকল্প প্রস্তাব ছিল, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে তাঁর পুলিশই যথেষ্ট। তাই রাজ্য সরকার নিজেই অপরাধের পরিসংখ্যান তুলে ধরে 'ক্রাইম ইন বেঙ্গল' তৈরি করবে। কিন্তু এই প্রস্তাব আর দিনের আলো দেখেনি।

পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের সংখ্যা বেড়ে চলার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্ষণের মামলায় সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢিলেমি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হরিভাই পারথিভাই চৌধুরী এ বছরই লোকসভায় জানিয়েছেন, ধর্ষণের মামলায় সাজা দেওয়ায় দেশের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ২৮ তম। কত বড় সাফল্য বলুন তো!

শুধু ধর্ষণ মামলাতেই নয়, সার্বিকভাবে সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রেই সাজা দেওয়ার ব্যাপারে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। এনসিআরবি-র রিপোর্টই বলছে, অপরাধীদের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের স্থান পিছনের সারিতে। সেটাও ২৮ নম্বরেই। ভদ্রলোকের এক কথা। এক নম্বর।

মানুষ পাচারেও এ রাজ্য দেশের মধ্যে এক নম্বরে। এমনকী দ্বিতীয় স্থানে থাকা তামিলনাড়ুর থেকে দ্বিগুণ পাচারের ঘটনা ঘটেছে এ রাজ্যে। পরিস্থিতি এতোটাই ঘোরাল যে এ রাজ্যের মানুষ পাচার নিয়ে ২০১৩ সালে তাদের রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। এনসিআরবি তথ্য-ই বলছে, বিদেশিরা এসে অপরাধ করছে, এমন ঘটনাও এই রাজ্যে সব থেকে বেশি। শিশুদের উপরে অত্যাচারের ক্ষেত্রেও বাংলা প্রথম সারিতে। এটাকেও সাফল্য মানবেন তো নাকি!

গত আট মাসে কলকাতা ও লাগোয়া এলাকায় অন্তত ১৩টি গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে। পাঁচটি ঘটনায় মৃত্যুও হয়েছে। আইনরক্ষা করতে গিয়ে শাসক দলের রোষে পড়েছে পুলিশ। বহু থানায় ঢুকে হামলা চালিয়েছে শাসক দলের কর্মীরা। গার্ডেনরিচে কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর তাপস চৌধুরীকে গুলি করে খুন কিংবা বীরভূমের দুবরাজপুরে সাব-ইন্সপেক্টর অমিত চক্রবর্তীকে বোমা মেরে খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল শাসক দলের। কলকাতায় পুরভোটে এসআই জগন্নাথ মণ্ডলকে গুলি করার ঘটনায় শাসক দল ঘনিষ্ঠ গোপাল তিওয়ারিকে পাকড়াও করলেও দোষী নেতাদের ছোঁয়নি লালবাজার। সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতান। তৃণমূল করুন। সঙ্গে অপরাধ ফ্রি।

— **সুন্দর মৌলিক**

কংগ্রেস কমিউনিস্টরা পরিকল্পনা মাফিকই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে

ড. জিষ্ণু বসু

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কালিয়াচক থানার দূরত্ব মাত্র ২৫ কিলোমিটার। জালনোট চক্র, আফিং চাষ, নারীপাচার, চোরাচালান ও গোপাচারের জন্য বহুবার সংবাদের শিরোনামে এসেছে এই অঞ্চল। গত ৩ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের এক অখ্যাত নেতার বহু আগে করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জমা হলো দেড় লক্ষ লোক। ওই সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতীরা থানার সব নথিপত্র পুড়িয়ে শেষে থানাতেই আগুন ধরিয়ে দিল। পুলিশ, বিএসএফের জিপ-সহ জ্বালিয়ে দিল দু'ডজন গাড়ি। তারপর ওই মৌলবাদীরা পার্শ্ববর্তী হিন্দুগ্রাম আক্রমণ করে। বালিয়াডাঙা গ্রামে গুলিতে আহত হলেন এক নিরাপরাধ যুবক। এই খবরে সারা দেশের সংবাদমাধ্যম আতঙ্কিত হয়ে উঠল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কোনো খবরই হলো না। গত বছর ৪ এপ্রিল গাজনের মেলায় ঢাকঢোল নিয়ে যাওয়ার অপরাধে নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার জুরানপুরে মৌলবাদীরা হত্যা করেছিল তপশিলি জাতিভুক্ত তিনজন প্রান্তিক চাষিকে। মারু হাজরা, তার ভাই শান্তনা হাজরা ও মারু হাজরার ছেলে ছিল সম্পূর্ণ নিরাপরাধ। কিন্তু ওই পরিবার দুটি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পায়নি। অথচ ১৯৮৫ সালের এসসি এসটি অ্যাক্ট (প্রভেনশন অফ এট্রোসিটি) অনুসারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সহায়তা পৌঁছানোর কথা। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কাছে এই অত্যাচারকেও খবর বলে মনে হয়নি। হাজরা পরিবার আজও ওই হামলায় পুড়ে যাওয়া ঘরে কোনোরকমে থাকে। নিহতদের বিধবারা, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো প্রায় নিরন্ন, ঘরে তো খেটে উপার্জন করার আর কোনো পুরুষ সদস্য উপস্থিত নেই।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর ঘটেছিল খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ। বর্ধমানের এই বিস্ফোরণের পরে প্রকাশ পেল দুই বাংলায় ছড়িয়ে থাকা জেহাদি মৌলবাদের জাল। রাজ্যের মানুষ দেখল কীভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আনুকূল্যে সহজে ভারতীয় ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড পেয়ে যায়। তারপর সিমুলিয়ার মতো খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে গরিব ছেলেমেয়েদের ভয়ানক দেশবিরোধী কাজে যুক্ত করে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টার দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরের জেহাদিদের সমর্থনে। দেশভক্তি, জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় স্লোগান দেওয়া হয়েছে। কলকাতার সংবাদমাধ্যম অবশ্য এই সাহসী পদক্ষেপকে ধন্য ধন্য করেছে। কোনো কোনো আঙ্গিক থেকে দেশাত্মবোধ অপ্রাসঙ্গিক তা নিয়ে পাতার পর পাতা উত্তর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাত্ত্বিকরা বুঝিয়েছেন, দেশপ্রেম আজকের সমাজকে কী কী ভাবে ক্ষতি করতে পারে। এসবের মধ্যেই যাদবপুরের ক্যাম্পাসে উঠেছে 'মণিপুরের স্বাধীনতার' দাবি। এই প্রথম ভারতবর্ষের কোথাও মণিপুরের আজাদির কথা উঠল। উত্তরপূর্ব ভারতে একটি সংগঠন বাদ দিয়ে অন্য সব সংগঠনই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাদের দাবি আদায়ের কথা বলে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, এত বেশি জেহাদি গতিবিধি, প্রকাশ্যে এত দেশবিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গেই কেন? প্রথমেই মনে হবে রাজ্য সরকারের ভূমিকা আর ক্ষমতাসীন দলের দায়িত্বের কথা। ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই যে দলের একমাত্র আদর্শ সেই দলের কাছ থেকে রাজ্যবাসী আশা করাটাই ছেড়ে দিয়েছে। হাজার হাজার গরিব মানুষের টাকা লুঠতে পেরেছে সারদা চিটফান্ড। সেই টাকার একটা অংশ বাংলাদেশে মৌলবাদী কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষমতায় এসেই সিমুলিয়ার মতো ১০ হাজার ৫০০ খারিজি মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়েছিল বর্তমান রাজ্য সরকার। খাগড়াগড়ের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনার পরে দলের দায়িত্বশীল নেতারা দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রলাপ করেছেন। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো আচরণেই আর রাজ্যবাসী অবাক হন না।

কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়াও সমাজের অন্যান্য প্রবুদ্ধরা কেন চুপ করে আছেন? খাগড়াগড়ের মতো ভয়ানক ঘটনার পরে, মালদার কালিয়াচকে যখন দেশের সুরক্ষাটাই বিপন্ন তখন ছাত্ররা তো রাস্তায় নেমে এল না! জুরানপুরের ওই বিধবাদুটির কান্না তো বাংলার কোনো হৃদয়বান সাহিত্যিক, কবির হৃদয়কে নাড়া দিল না। এই প্রশ্নটাই রাজ্যের মানুষের সামনে অনেক বড় আকারে উঠে আসছে।

তবে এটাও নতুন ঘটনা নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। নেতাজী সুভাষ যুদ্ধের মালবাহী গাধা, তার পিঠে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো। ভারতের শ্রদ্ধেয় মানুষদের অপমান করা বা 'ভারতের বরবাদির' এই ভাবনার পিছনের কারণটা কী? শুধুই কি জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতার বিরোধ? তা বোধহয় নয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থ জড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুটা আগে পরে পূর্ব ইউরোপের কতগুলি ঘটনা ঘটে। তাতে ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের চোখ চকচক করে উঠেছিল। ন্যাৎসি জার্মানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যান্ড ভাগ করে নেয়। ১৯৪০ সালের পর থেকে সোভিয়েত সেনা একের পর এক দেশ দখল করে। এস্টোনিয়া, লাতভিয়া আর লিথুয়েনিয়া দখল করে সেখানে সোভিয়েত মনোনীত পুতুলদের ক্ষমতায় বসানো হলো। আর অভূতপূর্ব নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পেল। এস্টোনিয়াতে ৯২.৪ শতাংশ, লাতভিয়াতে ৯৭.৬ শতাংশ এবং লিথুয়েনিয়ায় ৯৯.২ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিল ইউ. এস. এস. আর মনোনীত সরকার। তাই রাশিয়া বা চীন ভারতবর্ষ দখল করলে এখানে জনগণের সরকার স্থাপিত হবে। কমিউনিস্ট পার্টি ৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসবে। এই স্বপ্নের সবচেয়ে বড় বাধা ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। ভারত টুকরো টুকরো

হলে ছোট দেশ দখল অনেক সহজ হয়। তাই দেশ যখন স্বাধীনতার উপান্তে, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' (প্রথমে হিন্দিতে 'কনৈলা কী কথা') বইতে বললেন পাকিস্তানের দাবির যৌক্তিকতা। সুমের নামে একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলালেন— ''সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পূর্ববাংলার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন তাদের অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে?'' নেতাদের কথা শুনে কমরেডরাও বলতে শুরু করলেন, 'আগে পাকিস্তান দিতে হবে তবে ভারত স্বাধীন হবে।' কলকাতায় মুসলিম লিগ আর কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা একসঙ্গে বেঁধে মিটিং হলো। ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে তাড়া খাওয়া পশুর মতো এপারে পালিয়ে এলেন। মায়ের সামনে মেয়ে, মেয়ের সামনে মা ধর্ষিতা হলেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে ছোট ছোট ভাগ করার বামপন্থী ভাবনা প্রাথমিকভাবে সফল হলো।

স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথম লোকসভা নির্বাচনের পরে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মাকিনোনি বাসবপুন্নাইয়া-সহ চার সদস্যের প্রতিনিধি দল গেলেন রাশিয়ায়। যোশেভ স্ট্যালিনের আশীর্বাদ নিতে। ফিরে এসেই বন্ধ করে দিলেন তেলেঙ্গানা বিপ্লব। তার বদলে বাসবপুন্নাইয়া দিলেন তার থিসিস। ভারতবর্ষ এক হয়ে থাকাই তাঁর কাছে বিস্ময়কর। তাই এলাকাভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসন শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতবর্ষের শ্রেণীচেতনা যত বাড়বে ততই ক্ষীণ হয়ে আসবে জাতীয় অস্মিতা, দেশাত্মবোধ। এই থিসিসের উপর ভিত্তি করে আরও কতকগুলি খসড়াও উঠে আসতে থাকে দুই দশক ধরে। সবকটিই ছিল ভারতবর্ষের রাষ্ট্র হিসাবে অবলুপ্তির দলিল। কিন্তু এই মহতী প্রচেষ্টায় বাধা ছিল একটাই। স্ট্যালিন এশিয়ায় ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে নেহরুর বরবাদি ঠিক চাইতেন না। কিন্তু দিন চলে যাচ্ছে। ক্ষমতা তো আসছে না। পূর্ব ইউরোপের ঝলমলে ছবিতে ধুলো পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে চীন ভারত আক্রমণ করল। ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর পশ্চিমের রেজাংলা ও পূর্বে তাওয়াং দখল করে নিল চীন। সম্পূর্ণ একতরফা ভাবে। চীনের এই আক্রমণ ভারতের কমিউনিস্টদের আবার নতুন ভাবে উজ্জীবিত করল। শ্রীপাদ ডাঙ্গের মতো পুরাতন পন্থী, যাঁরা এতকাল রাশিয়ার ভজনা করতেন আর মস্কোর নির্দেশমতো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুরে সুর মেলাতেন তারা পার্টির মধ্যেই ফাঁপড়ে পড়লেন। উঠে এল উগ্র চীন সমর্থক গোষ্ঠী। যার মধ্যে বাংলারই প্রাধান্য। চীন ভারত আক্রমণ করেইনি। সব দোষ ভারতের। কমিউনিস্ট দেশ কারোকে আক্রমণ করেই না ইত্যাদি নির্জলা মিথ্যা কথা বলতে থাকলেন এইসব নেতারা। একইসঙ্গে গ্রামে গ্রামে দলাই লামার জীবনযাত্রা নিয়ে সর্বৈব মিথ্যা কুৎসা, চীনের নেতাদের মহানুভবতার গল্পগাথা প্রচার হতে লাগল। জেলাস্তরের মিটিংগুলোও শেষ হোত মাও সে তুং-য়ের জয়ধ্বনি দিয়ে। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে সর্বভারতীয় ভাবে তেলানি কনভেনশনে প্রকাশ্যে মাও-য়ের প্রতিকৃতি লাগানো হলো। ঘোষণা হলো কলকাতা কনভেনশনের। কলকাতা কনভেনশনে কোনোরকম রাখঢাক না রেখে একেবারে চীনের কাছে আত্মসমর্পণ। রাশিয়া পারবে না, চীনই পারবে। বাসবপুন্নাইয়া থিসিস ছাপিয়ে উঠে এল পরিমল দাশগুপ্তের খসড়া। আজিজুল হকও একটা খসড়া তৈরি করেছিলেন, তবে সেটা শেষ পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হয়নি। প্রকারান্তরে চীনকে ভারত আক্রমণের আহ্বান। দুই বিদেশি রাষ্ট্রের আনুগত্যের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এখানের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী সংগ্রামের নামে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখবে। এটাই বামরাজনীতির আসল দাঁত। সংসদীয় গণতন্ত্রের খাতিরে সিপিএমের মতো দলকে যেসব কথা বলতে হয় সেটা হাতির দেখতে পাওয়া দাঁত। ও দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যাবে না। সেটা সিপিআইএম, এম-এল, মাওবাদী, লিবারেশন সব ফ্লেবারের বামেরাই বিলক্ষণ জানেন। জানেন বলেই প্রয়োজনে আবহাওয়া অনুকূল দেখলে তাঁরা একও হয়ে যান। নব্বইয়ের দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব অতিবাম ছাত্রসংগঠন কাজ করত, তাদের কারণে অকারণে বেধড়ক মারধোর করত সিপিএমের হার্মাদরা। গত মাসে সেই অতিবামদের রক্ষা করার জন্য মানববন্ধনের নাটক করতে রাস্তায় নেমেছিলেন যাদবপুরের সিপিআইএমের শিক্ষকরা। কারণ চিবিয়ে খাওয়ার দাঁতটা দুজনের ক্ষেত্রেই এক।

ভারতকে ছোট ছোট টুকরো করার এই আদর্শগত মিলই কমিউনিস্টদের উগ্র জেহাদিদের কাছাকাছি এনেছে। গত কয়েকবছর আগে কলকাতার এক ফরেনসিক ল্যাবরেটোরির কর্তা বলেছিলেন, রেডিও কন্ট্রোল্ড এবং ভয়েস অ্যাকটিভেটেট এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের প্রযুক্তি মাওবাদীরা তালিবানদের কাছ থেকে কাশ্মীরি জঙ্গিসংগঠনের মাধ্যমে পেয়েছে। ২০০৯ সালের পর থেকে ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হয়েছে আই এস আই—সিমি—মাওবাদী সম্পর্ক। শহর এলাকায় অতিবামেদের দাঁড়ানোর জায়গা করে দিয়েছে জেহাদিরা।

বিনিময়ে ভারতবিরোধী জেহাদিরা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা সংস্থায় তাদের প্রকাশ্য সমর্থনের জন্য চাপ দেয়। এরা

যাদবপুরের ক্যাম্পাসে উঠেছে 'মণিপুরের স্বাধীনতার' দাবি। এই প্রথম ভারতবর্ষের কোথাও মণিপুরের আজাদির কথা উঠল। উত্তরপূর্ব ভারতে একটি সংগঠন বাদ দিয়ে অন্য সব সংগঠনই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাদের দাবি আদায়ের কথা বলে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, এত বেশি জেহাদি গতিবিধি, প্রকাশ্যে এত দেশবিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গেই কেন?

যৌথভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জায়গাগুলো খোঁজে। জাতপাত, প্রাদেশিকতা যেসব যন্ত্রণা ভারতের মানুষকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে সেগুলো তাদের অস্ত্র হয়ে ওঠে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই অতিবাম সংগঠনগুলি মার্কস, লেনিন, মাও ইত্যাদি বিদেশি আইডল ছেড়ে ভারতীয় মনীষীদের নামে সংগঠন শুরু করে। বাবাসাহেব আম্বেদকর, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহান মানুষদের নামের আড়ালে তারা ভারত বিরোধী গতিবিধি সংগঠিত করে। যদিও রোহিত ভেমুলাদের সংগঠনের নাম ছিল আম্বেদকর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু তারা দলিতদের নিয়ে প্রায় কোনো আন্দোলনই করেনি। তারা ইয়াকুব মেমনের জন্য স্মরণসভা ও উগ্র প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল। সেইসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নামে লাগাতার কুরুচিকর মিথ্যা পোস্ট করে চলেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কারণ তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দেশবিরোধী ইয়াকুব মেমন আপনজন আর 'স্বদেশমন্ত্রের' উৎগাতা বিবেকানন্দ প্রধান শত্রু।

অতিবাম নেতৃত্বও বিলক্ষণ জানে যে তাদের মূল ছাত্রশক্তির শ্রেণীচরিত্র ও ব্যক্তিচরিত্র কী। তাই তারা এই রাজপুত্রদের আমোদ প্রমোদে কখনো ব্যাঘাত ঘটায় না। শুধু মাঝে মধ্যে তাদের উচ্চতর মহল থেকে আসা নির্দেশ জোর করে পোস্টারে, স্লোগানে চালিয়ে দেয়। তাই ক্যাম্পাসের প্রতিটি স্লোগান, দেওয়াল লিখনই এই পরিকল্পনার অংশ, তাকে নিছক ছাত্র আবেগ ভাবা একেবারেই ভুল। যেমন গত মাসে যাদবপুরে 'মণিপুরের আজাদি'র দাবি উঠেছে। এই প্রথম সারা ভারতে কোথাও এই কথা তোলা হলো। সম্প্রতি ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড (এনএসসিএন) চুক্তি স্বাক্ষর করার পর উত্তরপূর্ব ভারতে আর কোনো সংগঠনই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে না। সবাই সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে নিজের সমস্যার সমাধান চাইছে। তাই হয়তো নতুন করে মণিপুরকে ভারত থেকে আলাদা করার কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা হয়েছে। তারই মহড়া হলো না তো, সুকুমারমতি ছাত্রদের মাধ্যমে?

প্রকৃতিতে এমন অনেক সৃষ্টি আছে যারা একে অপরের পরিপূরক। পরিভাষায় বলে মিথোজীবী। একজনের জীবন বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা প্রায় সবটাই নির্ভর করে অপরজনের উপর। একই ভাবে প্রথমজন না থাকলেও দ্বিতীয়জনের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেবে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থীদের এমনই মিথোজীবী সম্পর্ক। গান্ধীজীর ডাকা '৪২-এর আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল কমিউনিস্টরা। গান্ধীজী বিশ্বযুদ্ধের পরে পিসি যোশীকে লেখা চিঠিতে তাঁর উষ্মার কথা গোপন করেননি। কিন্তু স্বাধীন ভারতে ক্ষমতা হাতে পাবার পরে গান্ধীবাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সামান্যই সম্পর্ক ছিল। পাশ্চাত্য ভাবনা ও ভোগবাদ একটু একটু করে গ্রাস করছিল কংগ্রেসকে। এই আদর্শহীনতার জায়গাটাতেই একটু একটু করে ঢুকে যায় বামপন্থা। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের অনেক বড় বড় দুর্নীতির দোসর ছিলেন কমরেডরা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরে পরেই হয়েছিল সামরিক বাহিনীর জিপ কেনার কেলেঙ্কারি। জওহরলাল নেহরুর অতি ঘনিষ্ঠ বামপন্থী ভিকে কৃষ্ণ মেনন কোনো রকম নিয়ম কানুন ছাড়াই ১৯৪৮ সালে ৮০ লক্ষ টাকায় ২০০টি সামরিক জিপ কিনেছিলেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর আপ্ত সহায়ক কাল্যানম বলেছিলেন, ''উল্লেখ্য বিষয় হলো নেহরু তার সভায় দুর্নীতিগ্রস্ত কৃষ্ণ মেননকে নিয়েছিলেন। মেনন প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকার সময় কুখ্যাত 'জিপ কেলেঙ্কারিতে' জড়িয়ে পড়েছিলেন।''

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে নেহরুর কংগ্রেস ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একযোগে চরম নিষ্ঠুরতা করেছিল। নেহরু বলেছিলেন নেতাজীর আজাদ হিন্দী বাহিনী ভারতে ঢুকলে তিনি তরোয়াল হাতে অভ্যর্থনা জানাবেন। বামপন্থীরা তাঁকে তোজোর কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আজ মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার যে তাইহুকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি। অথচ কংগ্রেস শাহনওয়াজ খানদের মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে কিনে ফেলল। মিথ্যা বিমান দুর্ঘটনা জনমানসে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলো। নেতাজী সুভাষের বুকের রক্ত জল করে সংগ্রহ করা আইএনএ-র বিপুল ধনসম্পদ কে আর দামলে নামের এক আই সি এসের মাধ্যমে কোনোরকম কাস্টমস পরীক্ষা ছাড়াই দেশে নিয়ে এলেন নেহরু। আজকের গবেষণায় উঠে এসেছে আরেক চাঞ্চল্যকর সত্য। নেতাজী শেষ জীবনটাতে সম্ভবত সাইবেরিয়ার কোনো জেলে ছিলেন। অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় বললে, দেশপ্রেমিক ভারতের বীর সন্তান নেতাজী সুভাষের উপর হওয়া এইরকম নিষ্ঠুর আচরণের খবর জেনেও চুপ করে থাকার 'মোটিভ' এবং 'অপরচুনিটি' ভারতের দুটি রাজনৈতিক শক্তির হাতেই ছিল--- নেহরুপন্থী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি।

আজ বাংলার নতুন প্রজন্ম জানেই না ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম। যে মানুষটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানের গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এসে বাংলার চরম দুর্দিনে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টার জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডটুকু মৌলবাদী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেই মুক্ত চিন্তার, অসাম্প্রদায়িক পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে নেহরুপন্থী কংগ্রেস আর কমিউনিস্টরা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শ্যামাপ্রসাদ। সংসদে নেহরুর অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ শ্যামাপ্রসাদ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বেঁচে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই বামপন্থার জগদ্দল পাথর অবশ্যই চেপে বসত না। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষের 'বরবাদি' শ্যামাপ্রসাদ প্রাণ দিয়ে ঠেকাতেন। সেই তাগিদের ছুটেছিলেন কাশ্মীরে। নেহরু আর শেখ আবদুল্লার ষড়যন্ত্রে কাশ্মীরে খুন হলেন তিনি। ২৩ জুন ১৯৫৩, এই খবর পৌঁছোতেই দেশের মধ্যে ঝড় উঠল, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। কংগ্রেস সরকার পরিকল্পনা করে মৃতদেহ মধ্যরাত্রে বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। কিন্তু তখনও সেখানে হাজার হাজার মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে এত মানুষে ঢল নামেনি কারোর প্রয়াণে। সেদিন মানুষের চোখে জল যেমন ছিল, তেমন ছিল প্রতিজ্ঞা। এই অন্যায়ের বিচার চাই। আশ্চর্যজনক ভাবে বামপন্থীরা আদাজল খেয়ে লাগলেন এই উষ্মা প্রশমনে। এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়ার জন্য ১৯৫৩ সালে জুন মাসের শেষ সপ্তাহেই শুরু হলো জঙ্গি আন্দোলন। ১৩টি ট্রাম পোড়ানো হলো। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর ঠিক এক মাস পরে ২২ জুলাই ময়দানে ট্রামভাড়া নিয়ে ১৪৪ ধারা ভেঙে সভা করলেন জ্যোতি বসু। কংগ্রেস আর বামপন্থীদের মিলিত চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে গেল বাংলার মানুষ। তারপর থেকে পাঠ্যপুস্তক, আলোচনা সভা, সরকারি অনুষ্ঠান, তথাকথিত ঐতিহাসিক রচনায় পরিকল্পিত ভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হলো শ্যামাপ্রসাদকে।

আইনের শাসনই সঙ্কট মোচনের একমাত্র রক্ষাকবচ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

কান পাতলে শোনা যায়, চোখ মেললে দেখা যায় আজকাল পশ্চিমবাংলার পথে প্রান্তরে উন্নয়নের বাদ্যি বাজছে, বিকাশের ছটায় সর্বত্র আলোকিত আর সর্বত্র অনুপ্রেরণার প্রবল বেগ। ইংরেজ শাসনে সরকারি প্রশাসক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১২৭৯) বাঙালি সমাজের ছবি এঁকেছিলেন। 'ইংরেজ স্তোত্র' রচনায় তিনি লিখেছিলেন— ''তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ এবং তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। ...হে অন্তর্যামিন! আমি যাহা কিছু করি তোমাকে ভুলাইবার জন্য। আমি তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব। তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশ দাও, আমার সর্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর রায়বাহাদুর কর, কাউন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।'' দীর্ঘদিন পদানত থাকলে শিরদাঁড়া সোজা থাকে না, তাই সরীসৃপ সুলভ মানসিকতার প্রকোপ বাড়তে থাকে।

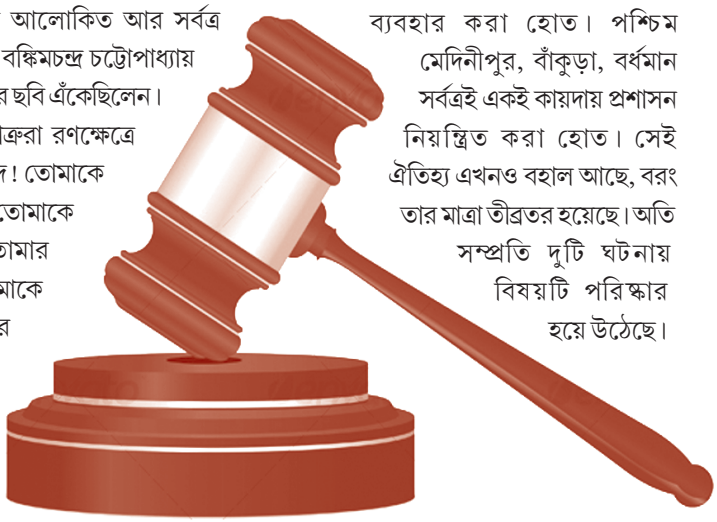

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্যাহ্নকালে সাধারণ প্রশাসক বঙ্কিমচন্দ্র জাতির কাপুরুষতা, ভীরুতা ও তোষামুদে চরিত্র সম্পর্কে যে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন, স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনে সেইরকম আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃঢ়তা কল্পনা করা যায় না। গণতন্ত্রের নামে পরিবারতন্ত্র, ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র, কদর্য দলতন্ত্রের পাশাপাশি দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের অভিঘাতে জাতীয় জীবন ও জনসমাজ সঙ্কটে নিমজ্জিত।

ভারতে এখন সংসদীয় গণতন্ত্র। সংবিধানের বিধানের উপর কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসন চলছে। মন্ত্রীরা ক্ষমতায় বসেন সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে, পক্ষপাতশূন্য আচরণের প্রতি অঙ্গীকার জানিয়ে। কিন্তু ক্ষমতার মধু ভক্ষণ করেই প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যান। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের আবর্তে প্রবেশ করেন।

কেমন চলছে প্রশাসন? আইন ও নিয়মবিধি অনুসারে প্রশাসন চলছে না। তাছাড়া প্রশাসনের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ সমস্ত ক্ষেত্রেই নিয়মবিধি লঙ্ঘনের প্রতিফলন পড়েছে। পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় বৈধ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে তা সবারই সুবিদিত। সম্প্রতি ১৮ ফেব্রুয়ারি কান্দি পুরসভায় বোর্ড গঠনের পূর্বে একজন কাউন্সিলারের হদিশ মেলে না। বোর্ড গঠনের মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেই অপহৃত (?) কাউন্সিলারের হদিশ মেলে। পুলিশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে। এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর রায়দানকালে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন ''প্রশাসনের কাজের করুণ চেহারাটাই বেরিয়ে এসেছে। সব মেরুদণ্ডহীন লোক প্রশাসনে বসে রয়েছে। এদের চাপ নেওয়ার ক্ষমতাও নেই, কাজ করার ইচ্ছেও নেই'' (এই সময়, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। মহামান্য বিচারপতির পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় রাজ্য প্রশাসন কোন চোরাবালির মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।

প্রশাসন কীরকম দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা হয় তা পশ্চিমবাংলার মানুষ স্বচক্ষে দেখেছেন। বামফ্রন্ট জমানায় মহাকরণ নয়, দলীয় কার্যালয় আলিমুদ্দিন ছিল ক্ষমতার স্নায়ুকেন্দ্র। অনুগত আধিকারিকদের দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হোত। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান সর্বত্রই একই কায়দায় প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত করা হোত। সেই ঐতিহ্য এখনও বহাল আছে, বরং তার মাত্রা তীব্রতর হয়েছে। অতি সম্প্রতি দুটি ঘটনায় বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

পশ্চিম বাংলায় বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন। এই অবস্থায় দুজন আধিকারিকের প্রতি পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একজন হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রাক্তন এস পি ভারতী ঘোষ। তাঁকে প্রবল জনমতের চাপে পদ থেকে সরিয়ে জঙ্গলমহলের বিশেষ আধিকারিক নামে নতুন একটি পদে স্থানান্তর করা হয়েছে। ভারতী ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্যা। ওই পরম আস্থাভাজন অফিসার সবং কলেজে ছাত্র প্রহার ও মৃত্যুর ঘটনায় শাসকদলের ছাত্রদের পক্ষ নিয়েছিলেন। আবার খড়্গপুর পুরসভায় নির্বাচনে শাসকদল জয়ী না হলেও অন্য দলগুলির বিজয়ী সদস্যদের শাসকদলের পক্ষে আনতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এইরকম কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসারকে ঘুরপথে নতুন পদ সৃষ্টি করে নজরদারি করার সুযোগ দেওয়া হলো। আর অন্যদিকে একজন আই এ এস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তীকে বিগত

চার বছরে বেশ কয়েকটি পদে ঘুরপাক খাওয়ানো হয়। বর্তমানে তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার। তাঁর অন্যায় হলো কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে বিভাগের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের মিটিং ডেকেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে কম গুরুত্বপূর্ণ জৈব প্রযুক্তি বিভাগের সচিব পদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তোষামুদে অনুগত সচিবদের পুরস্কার ও নিরপেক্ষ কর্তব্যনিষ্ঠ আমলাদের হয়রানি--- এটাই হলো প্রশাসনিক ব্যবস্থার চালচিত্র। পশ্চিমবঙ্গে এইরকম স্টাইল শুধু এখন নয়, বাম আমলেও চলেছিল। নন্দীগ্রাম কাণ্ডে অনুগত পুলিশ অফিসারদের কাণ্ডকারখানা সকলেই জানেন। হরিয়াণার আই এ এস অফিসার অশোক খেমকা রাজনৈতিক প্রভুদের রোষানলে পড়ে এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে বদলি হয়েছিলেন। প্রশাসন যদি রাজনৈতিক দলীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে প্রশাসকদের নিরপেক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ আচরণ এবং কর্মদক্ষতা খর্ব হয়।

প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা না থাকলে আইনের শাসন সুরক্ষিত করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় যে হিংসার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলা করা এক কথায় অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সুনিশ্চিতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের অবয়ব ধারণ করেছে। সংবাদপত্রের ভাষ্য নয়, টিভি-র একঘেয়ে সম্প্রচার নয়, মানুষ নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে পারছে আইনের শাসন এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। জানুয়ারি (২০১৬) থেকে যেসব ঘটনা প্রবাহ চলছে, তা কোনো বিক্ষিপ্ত আচমকা কাণ্ড নয়। ভেবে দেখুন মালদহের কালিয়াচক থানা আক্রমণের জন্য একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রায় দুই লক্ষ মানুষের হুঙ্কার ও পেশী শক্তির আস্ফালন। প্রশাসন নির্বিকার, চোখের সামনে থানায় অগ্নি সংযোগ করা হলো। একি ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনতার থানা আক্রমণ? আসলে আফিম চাষ, জালনোটের কারবার, গোরু পাচার, বিদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশের ভূস্বর্গ মালদহ। এই জেলায় সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪৭ সালে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য এই জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। না হলে এমন নরক গুলজার হোত না। আর ভোটব্যাঙ্কের জন্য সংখ্যালঘু তোষণের এমন নির্লজ্জ আচার আচরণ দেখা যেতো না। ধর্মগুরুদের সামনে নতজানু হওয়ার প্রয়োজন থাকত না। মালদহ কাণ্ডে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া কোনো অজ্ঞাত কারণে নীরব। অথচ দিল্লীর জি নিউজ, ইন্ডিয়া টুডে চ্যানেল এই ভয়াবহ কাণ্ডের বিবরণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ইন্ডিয়া টুডে মালদহ কাণ্ডকে 'ভারতের আফগানিস্তান' বলে চিহ্নিত করেছে। ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে সমাজ-বিরোধী ও দেশবিরোধী উপকরণের সম্বন্ধিত রূপ মালদহ হাঙ্গামায় পরিস্ফুট হয়েছে। জানুয়ারি মাসের শেষদিকে আর একটি ঘটনা ঘটল খোদ কলকাতার বুকে। গণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রেড রোডে সেনাবাহিনীর মহড়া চলছিল। আর শাসকদলের নেতা মহম্মদ সোহরাবের ছেলে আম্বিয়া সোহরাব মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোয় ভারতীয় বিমান বাহিনীর জওয়ান অভিমন্যু গৌড় নিহত হলেন।

পশ্চিম বাংলায় যে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে বিরোধী দলগুলি থেকে পুলিশকর্মী কেউই রেহাই পাচ্ছে না। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে কামদুনি কাণ্ড সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। এমনকী শাসকদলের মধ্যেও খুন, সংঘর্ষ চলছে। গ্রাম বাংলার বীরভূম বধ্যভূমিতে পরিণত। আর রাজারহাট নিউটাউন অঞ্চল সিন্ডিকেট রাজের দৌরাত্ম্যে কলুষিত।

পরিত্রাণের উপায় কী? বিগত বাম শাসন থেকেই প্রশাসন শাসক দলের চোখ রাঙানির কাছে নতিস্বীকার করেছে। নন্দীগ্রাম, নানুর, নেতাই প্রভৃতি এলাকায় পুলিশ প্রশাসন সিপিআই (এম) দলের সশস্ত্র ক্যাডারদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ২০০০ সালে ছোট আঙারিয়া হত্যাকাণ্ডের সময় গড়বেতা থানার সেই সময়ের ওসি অগ্নিদগ্ধ মৃত মানুষদের অগ্নিদগ্ধ জীবজন্তু বলতে সঙ্কোচবোধ করেননি। তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল। 'পরিত্রায়াণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' এখন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে 'বিনাশায় সাধূনাম্' এ পরিণত হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখছি এক দল আসে এক দল যায়। পুলিশ প্রশাসন আনুগত্যের জার্সি বদল করে, ক্যাডাররা দল বদল করে। লাল থেকে সবুজে আসতে বেশি দেরি হয় না। বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত গান, নাচ, চলচ্চিত্র ও নাটকের জগতের মানুষ নতুন সাজে সজ্জিত হয়। আজকের বিরোধীদলগুলি ক্ষমতায় বসলে আচার আচরণ ঠিক রাখবেন তো? প্রয়োজন মুক্ত চিন্তার পরিবেশের। আর সেজন্য রাজনীতি ও প্রশাসনের অশুভ মেলবন্ধন দূর করতে হবে। সরকারি নীতি ও বিধান অনুসারে প্রশাসনকে চলতে হবে। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, সততা ও দক্ষতা বজায় রাখতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরি হলো নৈতিক শক্তি। ভয় ভীতি দূর করে অধিকাংশ আধিকারিক যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন, তাহলে রাজনৈতিক প্রভুদের দাপট হ্রাস পাবে। তাই দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে প্রয়োজন নিরপেক্ষ প্রশাসন। আইনের শাসনই হলো দেশ ও সমাজের পরিত্রাণের একমাত্র পথ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন প্রায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানারকম কূটকচালিতে ব্যস্ত। জোটগঠনের কথাবার্তাও চলছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি কি প্রশাসন থেকে দলীয় রাজনীতির অশুভ প্রভাব বিযুক্ত করতে পারবেন? ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা কি সংবিধান সম্মত ন্যায়নিষ্ঠ আচার আচরণ করবেন? সাধারণ মানুষ এখন দলীয় রাজনীতির বিষবাষ্পে দগ্ধ। গণতন্ত্র ও শান্তির বাণী কি ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হবে না? ক্ষমতাসীন দলকে কি অশুভ শক্তি আবদ্ধ করবে না? ক্ষমতার সঙ্গে কায়েমি স্বার্থ কি আবদ্ধ হবে না? সমিতির রাজনীতির দাপট থাকবে না? অফিস, আদালত, শিক্ষাঙ্গন কি রাজনীতির কারবারীদের দাপট থেকে মুক্ত থাকবে? পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন যে পরিবর্তন নয়, বরং কুনাট্যের ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতার মূলোচ্ছেদ ঘটবে কিনা সেটাই মূল প্রশ্ন।

(লেখক স্টেট আর্কাইভ-এর প্রাক্তন আধিকারিক)

আইন-ই যদি শৃঙ্খলিত হয়

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য

আইন নামক বস্তু দিয়ে যখন দেশ গড়ার কথা, রাজ্যকে সুরক্ষিত করার কথা, তখন জনগণের ভোটে পরিপুষ্ট হয়ে সেই আইনকেই পদদলিত করে দেশের একতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা বলতে যে অবশিষ্ট আর কিছুই নেই তা যে কোনো সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারছেন। আইন ও শৃঙ্খলা এই দুইটি শব্দ একে অন্যের পরিপূরক। আইন তৈরি করা হয় একটি সমাজবদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তার সমস্ত সাংবিধানিক অধিকারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে পরিচালিত করার উদ্দেশে। আবার অপর দিকে মানুষ যদি উশৃঙ্খল হয়ে তাদের অধিকারকে ভোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে প্রয়োজন আইনের।

সহজ উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, একজনের যদি অধিকার থাকে রাস্তা দিয়ে চলার তাহলে আইনের অনুশাসনে রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া উচিত যানবাহনের গতিপথকে তরান্বিত করার জন্য। না হলে সেই যানবাহনের যাতায়াতের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

অর্থাৎ রাজ্যের পরিচালনার জন্য যে আইন তৈরি হয় তা সমষ্টিগত জীবনকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে সকলের অধিকারকে একটা নিয়মের মধ্যে রেখে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য প্রতিটি সরকার দায়বদ্ধ। সেইজন্য রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা সংবিধানের 'State List'-এ প্রাধান্য দেওয়া আছে। যা রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং রাজ্য পুলিশ এই ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অধিকার প্রাপ্ত।

এই আইন আবার তৈরি হয় এবং মান্যতা পায় বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের দ্বারা। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা বিচারবুদ্ধিহীন স্বার্থপর মানুষের হাতে যখন এই ক্ষমতা যায় তখন আইনসভার গরিমা নষ্ট হতে বেশি সময় লাগে না। বামপন্থীদের ৩৪ বছরের রাজত্বে আমরা দেখেছি এই আইনকে কীভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে শুধু ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি আইন যাদের হাতে সেই পুলিশ প্রশাসনকে রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে এই বামপন্থীরা দীর্ঘ ৩৪ বছর বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য ব্যবস্থা করে এসেছে। যার ফল আমরা নেতাই কাণ্ড থেকে নন্দীগ্রাম, বর্ধমানের সাইবাড়ি থেকে ২১ জুলাই-এর ধর্মতলা এলাকায় নরহত্যা, আবার মরিচঝাঁপির অসংখ্য নিরপরাধ উদ্বাস্তুদের ওপর পাশবিক অত্যাচার এবং নিরীহ আনন্দমার্গীদের পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনার সাক্ষী থেকেছে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। শাসকদল যখন ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে তারা নেকড়ের থেকেও হিংস্র জীব হয়ে যায়। যেনতেন প্রকারেণ সেই ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে আইনের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করার প্রবণতা জাগ্রত হয়। ফলে সেই রাজ্যে আইনের সুশাসন বলতে নামমাত্র কিছু থাকে না। এরাই আবার গণতন্ত্রপ্রেমী, কৃষকপ্রেমী, শ্রমিক দরদির নামাবলি জড়িয়ে তাদেরই শোষণ করার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থার মধ্য থেকে বেরোবার একটা রুপালি রেখা দেখেছিল বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। বিগত ২০১১-তে এই বামফ্রন্ট নামক জগদ্দলকে সরিয়ে তারা ক্ষমতায় আনে তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বঙ্গবাসীর সেই সুখের দিনের স্বপ্ন বেশিদিন স্থায়ী হলো না। মাত্র সাড়ে চার বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই দেখতে পেলাম লাল তৃণমূলের আসল চেহারা। আসলে এই দলটি অনেকটা 'Assembled Computer'-এর মতো। বাজারে দেখবেন কিছু ব্র্যান্ডের কম্পিউটার পাওয়া যায়। যেগুলোর প্রতিটি অংশ একই কোম্পানির। আবার কিছু Assembled Computer হয়। যেগুলো বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি অংশকে নিয়ে একত্রিত করে বানানো হয়। এই বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সেই একত্রিত করা বিভিন্ন অংশের সমন্বয়। আর এই ধরনের কম্পিউটারের অংশগুলি যদি সস্তার হয় তবে সেই কম্পিউটারের আয়ু সামান্য, দেখতে তা যতই সুন্দর হোক না কেন।

তৃণমূল কংগ্রেস নামক এই রাজনৈতিক দলটি ঠিক সেই রকম। আর এর অংশ বা

পার্টসগুলো ওই আরাবুল, মণিরুল, অনুব্রতদের দিয়ে তৈরি। তার সঙ্গে আবার চাকচিক্য আনার জন্য তাপস পালের মতো 'চন্দননগরের মাল'ও আছে। (এটাও তাঁরই কথা, মাফ করবেন)। এই রকম একটি দলের বিধায়করা যখন বিধানসভা ভবনের মধ্যে বসেন, তখন আইনসভার যে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হবে তা তো জানার কথা। আর সেই আইনসভা থেকে যা আইন তৈরি হবে তা যদি আম্বেদকর সাহেব আগে বুঝতে পারতেন তবে তিনি সংবিধান রচনা না করে বঙ্গবিধান রচনা করতেন এই মহীয়সী নেত্রীর অনুকরণে। তাহলে বিচারপতিকে অন্তত বলতে হোত না যে সংবিধানের বলাৎকার করা হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আইন প্রশাসন যাদের হাতে সেই পুলিশও আজ বাঁচার তাগিদে সংবিধানের অধিকারকে বগলে করে টেবিলের নিচে লুকোচ্ছে।

যাদবপুরের শিক্ষাঙ্গণের ভবিষ্যৎ আজ ব্রা ও প্যান্টি পরে টিভি ক্যামেরার সামনে সমাজের শৃঙ্খলার নগ্ন রূপকে প্রকাশ করছে। আমাদের চিরাচরিত সংস্কারকে ভুলিয়ে অপ-সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দিবালোকে ছাত্র-ছাত্রীরা চুম্বনরত অবস্থায় নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। সমাজের জ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার বা সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে না। সামাজিক শৃঙ্খলার এই অধঃপতনের কাণ্ডারি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে না। কারণ তাঁরা তো বছরের পর বছর এই বামপন্থা নামক বিদেশি জারকে নিজেদের জারিত করে রেখেছেন।

বর্তমানে ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বামপন্থীদের একটা বড় অংশ লাল জামা ছেড়ে সবুজে রূপান্তরিত হয়ে নিজেদের আখের গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাদের চিন্তা, ভাবনা, শিক্ষার রাজনৈতিক শেকড় চীনের মাটিতে, তারা ভারতের সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে দেশের একতা ও অখণ্ডতাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আজ তৃণমূলের ক্ষমতার আশ্রয়ে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ ওই খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের মধ্যে আজ মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে এই আমাদের সোনার বাংলা। পাকিস্তান, আই এস আই- এর চরেরা আজ তৃণমূলের রাজনৈতিক ক্ষমতার আড়ালে পাকিস্তানে দিনের পর দিন পাচার করছে গুরুত্বপূর্ণ নথি, অথচ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মুখ্যমন্ত্রী চোখ বন্ধ করে আছে। আইন-শৃঙ্খলা আজ হাহাকার করে ফিরছে। দেশ ভাগের এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে এই রাজনীতির আড়ালে। শিয়ালদহ স্টেশন এলাকায় পাকিস্তানের পতাকা হাতে নিয়ে দেশবিরোধী শক্তির দালালরা দিব্যি ভাঙচুর চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগাতে। সংবাদমাধ্যম থেকে গোটা সুশীল সমাজ আমরা চুপ করে আছি, বারুদের গন্ধকে নাক টিপে আটকানোর জন্য।

বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের বাবা ও ছেলের দোকানে মদ ও মাংস খাওয়াতে বাধা পেয়ে শয়ে শয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের দোকান-ঘর স্টেশন চত্বর ভাঙচুর ও লুটপাট চালালো পুলিশের সামনে। আইন শুধু বইয়ের পাতায় আজ মুখ লুকিয়ে আছে। দুষ্কৃতী মাত্রই আইনের চোখে অপরাধী। তা কোনো সম্প্রদায়, জাতি মানে না। কিন্তু তৃণমূল নেত্রী তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নন। তিনি তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী। আর বামেদের মতো সংখ্যালঘু ভোটের লোভ তাঁর আরো বেশি। সুতরাং আইনও তাঁর নির্দেশে নতমস্তক হয়ে রয়েছে।

'সিমি' নামক একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি দেগঙ্গার দাঙ্গার পেছনে মদত দিয়েছিলেন হিন্দু নিধনের জন্য (সরকারি দপ্তরে এর প্রমাণ আছে), কেন্দ্রীয় সরকারের সাবধানতা বা সতর্কতা সত্ত্বেও মমতাদেবী কোন তাগিদে তাকে রাজ্যসভার সাংসদ করলেন তা আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে পরিষ্কার। আইন নামক বস্তু দিয়ে যখন দেশ গড়ার কথা, রাজ্যকে সুরক্ষিত করার কথা, তখন এই জনগণের ভোটে পরিপুষ্ট হয়ে সেই আইনকে পদদলিত করে আজ দেশের একতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী এই রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি এখনও আমরা চিনতে না পারি বা নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে চুপ করে থাকি তবে আগামী দিন যে সারা পশ্চিমবঙ্গ খাগড়াগড়, সমুদ্রগড় ও ক্যানিং বা দেগঙ্গা হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং মানুষকে ভাবতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান শুধু একটা ভোটের উৎসব নয়। অস্তিত্ব রক্ষার চাবিকাঠি। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ রাজনীতির জন্ম দেশের অস্তিত্বের সঙ্গে, দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে, দেশের সংস্কারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না হলে সেই দেশ বা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা একদিন ধ্বংস হতে বাধ্য।

(লেখক একজন আইনজীবী)

স্বস্তিকার গ্রাহক ও কার্যকর্তাদের প্রতি আবেদন

যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের পুনর্নবীকরণ বাকি আছে (ডাকযোগে অথবা কোনো এজেন্টের মাধ্যমে যাচ্ছে) অনুগ্রহ করে তাঁরা আগামী ৫ই এপ্রিলের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করুন, যাতে আগামীতেও আপনার পত্রিকা নিয়মিত পাঠানো সম্ভব হয়।

যে সকল এজেন্টের দু-মাসের বেশি বিলের টাকা বাকি আছে তাঁদের সত্বর টাকা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে আগামীতে বকেয়া টাকার কারণে স্বস্তিকা সরবরাহ বিঘ্নিত না হয়।

—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা

চিঠিপত্র

কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী গত প্রায় পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে আর্থিক অনটনের মধ্যেও একের পর এক প্রকল্প চালু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন প্রকল্পে নানা অনুদান দিয়ে আসছে। অথচ বাম আমলের মতোই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা মাঝে মাঝেই বলে থাকেন তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা রাজ্যের তহবিলে জমা পড়লেও সেই খাতে খরচ করা হয় না। আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও খেলা-মেলা-ক্লাবকে অনুদান, ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল, জুতো বিলির টাকা তাহলে কোথা থেকে আসছে? বাজার থেকে মাঝে মাঝেই যখন ঋণ নিতে হয় তখন সাধ্যের বাইরে এত অনুদান দেওয়ার যৌক্তিকতা আছে কি? আসলে ভোটের রাজনীতির জন্য রাজ্যে ঋণের বোঝা বাড়লেও কিছু যায় আসে না। এর নেপথ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা অনেকেরই অজানা নয়। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই এরাজ্যের মানুষ ভোট-জোট- নোট নিয়ে আলোচনায় মগ্ন। এসবের কাছে অগ্নিমূল্য বাজারদর, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, রেশনকার্ড নিয়ে অচলাবস্থা সহ নানা দুর্নীতি হার মেনে যায়। তাই বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি-সহ নানা সুযোগসুবিধার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। যাতে সব কিছু ভুলে আসন্ন নির্বাচনে মানুষের আস্থা অর্জন করা যায়। কিন্তু ৫ বছরের বেশি সময় ধরে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের রাজ্যে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোষণায় রাজ্য তথা দেশের কাছে বিপদ সংকেত হিসেবে দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখতে আরও একবার সংখ্যালঘু তোষণের উদাহরণ সৃষ্টি করলেন তৃণমূল নেত্রী তা বলা যায়। কিন্তু যেভাবে এদেশে বাংলাদেশি নাগরিকরা দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে তাতে মুখ্যমন্ত্রীর এই হঠকারী সিদ্ধান্ত পরোক্ষে সেই কার্যকলাপকেই মদত দেওয়ার সামিল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

তৃণমূল নেত্রীর অনুপ্রেরণায় কত ধরনের 'শ্রী', 'সাথী'-প্রকল্প চালু হচ্ছে এরাজ্যে। আর দান খয়রাতির নিত্য নতুন পথ চালু করে রাজ্যে ঋণের বোঝাও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

দেশবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করা প্রয়োজন

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যানুষ্ঠানের ব্যানারে দেশের শত্রু তথা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সংসদ আক্রমণের মূল ষড়যন্ত্রী আফজল গুরুকে শহীদের মর্যাদা দেওয়ায় জনগণ আর একবার দেশভাগের ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছে।

এখনও এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা জানেন দেশ বিভাজনের জন্য কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা কীভাবে জিন্নাহকে সাহায্য করেছিল। আবুল কালাম আজাদ, সর্দার প্যাটেলদের প্রতিবাদ ধোপে টেকেনি। তোষামদের মাধ্যমে জওহরলাল দেশভাগের সিদ্ধান্ত গান্ধীজীকে মেনে নিতে রাজি করিয়েছিলেন। জওহরলালের স্বপ্ন সফল হয়।

কাশ্মীর সমস্যা জওহরলালের সৃষ্ট। তিনি তাঁর বন্ধু শেখ আবদুল্লার আবদার মতো কাশ্মীরের অংশ তাঁকে উপঢৌকন দিয়ে বাকিটা পাকিস্তানের হাতে তুলে দেন এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হন। সেদিন পুরো কাশ্মীরের দখল নিলে আজ এরকম অবস্থা হোত না। এরূপ একজনের বংশধর রাহুল গান্ধী। স্বাভাবিক ভাবেই দেশের আপামর জনগণ তাঁর থেকে দেশপ্রেম আশা করে না যেখানে গদিপ্রেম তাঁর রক্তে। রাহুল গান্ধী দলিত ইস্যু নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করেন। ড. আম্বেদকর নিয়ে বড় বড় কথা বলেন আর ভারতের সংবিধান তথা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার চরম শত্রুদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেন।

আজ পাকিস্তান পন্থী এই দলটা এমন নীচে নেমেছে যে প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ার পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানের সাহায্য প্রার্থনা করছেন। উদ্দেশ্য দেশের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এক জাতীয়তাবাদী সরকারকে উৎখাত করা। পাকিস্তান কথা রেখেছে পাঠানকোটে জঙ্গি পাঠিয়ে। কংগ্রেসের ভণ্ডজাতীয়তাবাদের পলেস্তারা খুলে পড়ছে। আসল কথা ক্ষমতার বাইরে থাকা এদের ধাতে নেই। নাহলে দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘ নয় বছরের বিচার প্রক্রিয়া চলার পর সমস্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সুপ্রিমকোর্ট আফজলের ফাঁসির আদেশ দিলেও তা নিয়ে রাজনীতি করে।

দেশদ্রোহীরা সংখ্যায় নিতান্তই কম, আর তাঁদের সমর্থকগণও সংখ্যায় বেশি নয়। কিন্তু তাঁরা একটা বিষয়ে প্রবলভাবে ঐক্যবদ্ধ; তারা যেকোনোভাবে দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চায়। অপরদিকে কোটি কোটি নিরীহ শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর নিছক ঝামেলা এড়ানো পলায়নী মনোবৃত্তি দেশটাকে ক্রমশ খাদের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছে। এরকম একটা জাতীয় বিপর্যয়ে সমস্ত জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর উচিত রাস্তায় নেমে দেশবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করা।

—বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
পুরুলিয়া।

‘মুসলমান’ শব্দটি...

অমিত ঘোষ দস্তিদার

‘মুসলমান’ শব্দটি গোটা বিশ্বকে আজ কাঁপিয়ে দিয়েছে। আলোড়িত বিশ্ব আজ তিন ভাগে বিভক্ত। একভাগ সন্ত্রাসবাদী। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বের একটা বিরাট ‘মুসলমান’ অংশ এই ভাগে দাঁড়িয়ে। অনেক অমুসলমান তাদের কাজে ইন্ধন-যোগান দিচ্ছেন। কিন্তু আর একটা বড় অংশ সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করছেন, সবকিছু জেনেও না জানার ভান করছেন। এই মুসলমান এবং অমুসলমান তোষণকারীরা ‘মুসলমান’ মৌলবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছেন না বরং প্রশ্রয় দিচ্ছেন। খলিফাতন্ত্রী প্রক্রিয়াকে তাঁরা ‘মমতা-প্রক্রিয়ায়’ ‘দুষ্টু’ বলছেন, কিন্তু ব্যাপক অর্থে ঝড় তুলছেন না। বরং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট থেকে যাচ্ছেন। আর এক ভাগে আছে ‘মুসলমান’ শব্দের অনুসলমান অনীহাবাদীরা। যাঁরা আজ ‘মুসলমান’দের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছেন। তাঁদের অনেকেই ‘ভয়ানক বৈষম্য’ বলে আখ্যা দিচ্ছে। একে বলা হচ্ছে— অসহিষ্ণুতা।

ইউরোপবাসীর এক অংশ ‘মুসলমান’ শব্দটি সহ্য করতে পারছে না। মুসলমানদের ঘৃণ্য বলে মনে করছে, কেঁপে উঠছে রাগে এবং ঘৃণায়। এটা কি খুবই অযৌক্তিক? বিশ্বের কোনো অংশই মুসলমানকে স্থান দিতে কোনোদিনও পিছপা হয়নি। কিন্তু মুসলমানরা কি করে চলেছে? পৃথিবীর যে অংশেই স্থান পেয়েছে সেখানেই মুসলমানরা জন্মহার বাড়িয়ে ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সেই স্থানকে ভালো না বেসে বরং নিজেদের আধিপত্যে আনতে চেয়েছে। সেই স্থানের জীবনশৈলীতে আঘাত হেনেছে। আহার-বিহার, বেশ-বাস ও মুক্তমনের বিন্যাসকে তারা সমূলে বিলুপ্ত করে নিজেদের খলিফাতন্ত্র চালু রেখেছে। গোটা বিশ্বকে মুসলমান বানাবার তৎপরতায় আজও তারা ব্যস্ত। অখণ্ড ভারত কারা ভাঙল? পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হলো কেন? পাকিস্তান এবং তার আই এস আই-এর কাজকে কেন সন্দেহজনক বলে মনে করা হবে না? মসজিদ এবং মাদ্রাসা কি বিশ্বাসযোগ্য-আস্থার স্থান? এর উত্তর মুসলমানরাই আল্লার শপথ করে দিক না কেন। কেন পৃথিবীর মুসলমান সমাজ মুখ বন্ধ রেখেছে এটাতো একটা প্রশ্ন। সন্ত্রাসবাদী নয় এমন মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। তবু তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে মোকাবিলা করছে না কেন? ভূকম্পনে কেঁপে ওঠা নেপালের দুর্গতদের জন্য কেন পাকিস্তান মশলামাখানো শুকনো গোমাংস পাঠালো— এর উত্তর কে দেবে? নাইজেরিয়া-সহ সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকাতে ইসলামি সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেল কেন? বিশ্বের সমস্ত অমুসলমান দেশে মুসলমানরা সম অধিকার চাইবে অথচ নিজেদের আইন এবং প্রভাব খাটাবে, এটা তোষণকারীরা মানতে পারে কিন্তু কোনো শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক তা মানবেন না।

মধ্যপ্রাচ্য-সহ বহু দেশে হত্যা করা হলো সুলেহকুলে (বিশ্ব শান্তি) বিশ্বাসী আল্লার অনুগামীদের। এইভাবে বিগত তেরো-চোদ্দ বছরে মুসলমানদের দ্বারা নিহত হলো প্রায় দশ লক্ষ মুসলমান। ইরাকে ইয়াজিদি সম্প্রদায় এবং খৃষ্টান জনগোষ্ঠীকে ইসলামিক স্টেট (আই এস) দ্বারা যে জঘন্য অত্যাচারের উল্লেখ বিগতদিনে আমরা পেয়েছি, ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের হিন্দুরাও মৌলবাদীদের দ্বারা খেপে খেপে আক্রমণের শিকার (যে ফর্মূলায় পাকিস্তান হিন্দুশূন্য করা হয়েছে) হচ্ছেন না কি? এর প্রতিবাদ কোনো তোষণবাদী করেন না কেন? এক্ষেত্রে তাঁরা অসহিষ্ণুতার কোনো কারণই খুঁজে পান না কেন? ভালো করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকাবার চেষ্টা করুন।

বিশ্বের বেশ কিছু মুসলমান তোষণকারীরা আমেরিকায় ঘটে চলা মুসলমান বিরোধী দরবারের দিকে তাকিয়ে বলছেন— ‘সন্ত্রাসীরা মুসলমান কিন্তু সব মুসলমানই সন্ত্রাসী নয়।’ ইউরোপের চরম দক্ষিণপন্থীরা, যারা ‘মুসলমান’ শব্দটি শুনলেই কেঁপে উঠছে— তাদের দিকে তাকিয়েও মুসলমান তোষণকারী দিগ্‌গজরা হায়-হায়- গেল-গেল রব তুলছে। যাঁরা ‘মুসলমান’ শব্দটিকে তোষণের জপমন্ত্র করে রেখেছেন তাঁরা মুসলমান সমাজকে বিশ্ব আঙ্গিকে ভালো প্রমাণে ঝাঁপানোর আহ্বান জানান মাদ্রাসা ত্যাগ করে সকলের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে ফিরতে। খলিফাতন্ত্রী মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অমুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একজোট হয়ে লড়তে বলুন। রাষ্ট্রীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মানতে বলুন। রাষ্ট্রীয় এক আইন, এক শিক্ষা পদ্ধতিতে আসতে বলুন। রাজনীতির খোরাক হতে মানা করুন। নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পদ্ধতি ত্যাগ করতে বলুন।

দীর্ঘদিন ধরে অমুসলমানরা বন্ধুত্বের হাত এগিয়েই রেখেছে, কিন্তু মুসলমানরাই বিশ্বের কোথাও সেই হাত ধরছে না। যদি তারা মিলতে পারে তবে সমস্যা আর থাকবে না। মূল সমস্যায় গিয়ে তোষণকারীরা যদি কাজ করতে পারেন, কুসংস্কারগুলিতে যদি আঘাত হানতে পারেন, তবে দেখবেন ‘মুসলমান’ শব্দটি আর অপছন্দের থাকবে না। আলিঙ্গনের মধ্যেই থাকবে। সত্যিই যদি ভালো চান তবে আলিঙ্গনের ব্যবস্থা করুন। তা না হলে তো দরজা বন্ধ হতেই থাকবে, আর ‘মুসলমান’ শব্দটি বন্ধ দরজার বাইরেই থেকে যাবে।

আগামীদিনে হয়তো অভিধান থেকেই ‘মুসলমান’ শব্দটি বিলীন হয়ে যাবে। ■

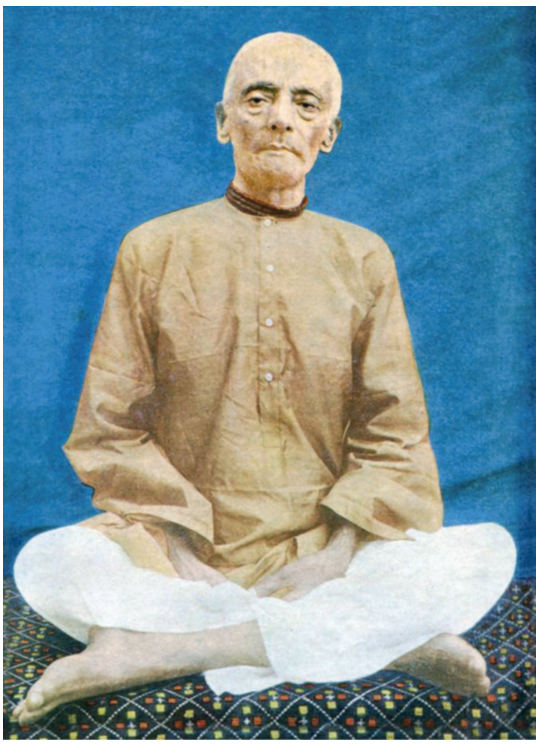

জাতীয়তাবোধ ও মানবপ্রেমের প্রতীক

শ্রীরাম ঠাকুর

দেবব্রত ঘোষ

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এক সন্ধিক্ষণ। সে যুগে বাংলায় নবজাগরণের প্লাবন এসেছিল। যে কোনও যুগে, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে রাষ্ট্রীয় অপশাসন ও বৈদেশিক শাসনের এবং সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রথমেই এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমান্তরাল ধারায়। পরাধীন ভারতের পূর্ব প্রান্তে আমাদের এই অবিভক্ত বাংলায় ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঠিক তাই হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরাম ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার কিছুকাল পরে স্বামী প্রণবানন্দ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, আনন্দময়ী মা-সহ অনেক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে বাংলার মাটি উর্বর হয়েছিল, এসেছিল এক মানবতাবোধ ভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবোধ, অখণ্ড দেশ চেতনা। প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার ভিত্তিতে দেশজভাবে জারিত ঐক্যবোধ যা শ্রীচৈতন্য পরবর্তী যুগে অভিনব।

জাতীয়তাবোধের জাগরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বা শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা বহু আলোচিত হলেও অন্যান্য আবির্ভাবগুলো উপেক্ষিত বা অনালোচিতই থেকে গেছে, বিশেষ করে শ্রী রামঠাকুরের নাম। শ্রী রামঠাকুর আমাদের ইতিহাসকে কীভাবে বদলে দিয়েছিলেন, কী প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিলেন ভারত চেতনাকে, তা লোকচক্ষু ও জ্ঞানের বাইরে থেকে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীরাম ঠাকুরের বিরাট প্রভাব ছিল। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে সুবিশাল অবদান ছিল অনুশীলন সমিতির ও যুগান্তর দলের যারা ইংরেজ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। অনেকেই জানেন না এই দুই বিপ্লবী দলের বহু প্রথম সারির নেতাই শ্রীরাম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। নগেন্দ্র কুমার গুহরায়, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, কেশবলাল ঘোষ, জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত এই বিপ্লবী নেতারা সকলেই শ্রীরামঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন প্রধানত শ্রীরামঠাকুরের কাছেই। এটা প্রমাণিত সত্য।

শ্রীরামঠাকুর দুটো ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। (১) অখণ্ড ভারত খণ্ডিতরূপে স্বাধীনতালাভ করবে ভূগোল ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে। (২) আপনারা স্বরাজ পাইবেন না, গুণ্ডারাজ পাইবেন। (প্রসঙ্গত জানাই শ্রীরামঠাকুর পূর্ববাংলার বাঙালভাষাতে কথা বলতেন)। আমরা জানি তাই হয়েছে। কিন্তু কেন হলো? কারণ আমরা ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালিরা তিনটে অপরাধে অপরাধী। প্রথম অপরাধ— আমরা ভারতীয় বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, দ্বিতীয় অপরাধ আমরা অখণ্ড জাতীয়তাবোধের বদলে মেকি আন্তর্জাতিকতায় আসক্ত, তৃতীয় অপরাধ— আমরা ধর্মদ্রোহী। ধর্মদ্রোহিতার দুটো রূপ। প্রথম রূপ— হিন্দুধর্মকে নিন্দে করে, অবজ্ঞা ও অপমান করে অন্য ধর্মের প্রতি তোষণমূলক আচরণ করা, দ্বিতীয় রূপ— অন্যধর্মের মানুষ হিন্দু বিদ্বেষী আচরণ করলেও তাকে সমর্থন করে সেকুলার সাজা।

শ্রীরামঠাকুর জাতিভেদ মানতেন না (গীতা, ভাগবত, বেদান্ত জাতিভেদ মানে না)। ঠাকুর বর্ণভেদ স্বীকার করতেন যা গীতা, ভাগবত, উপনিষদ স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক কারণে। শ্রীরামঠাকুর হলেন চৈতন্যদেবের নব কলেবর। শব্দের মধ্যে প্রবল শক্তি নিহিত আছে এবং ভাব ও দিব্য রূপের প্রকাশ শব্দের মধ্য দিয়েই আসে বলে হিন্দুধর্মে শব্দব্রহ্ম বা নাদ্‌-এর এতো গুরুত্ব। নাভি থেকে শব্দের উত্থান, বুকের আবেগ শব্দকে

সিক্ত করে (যাকে বলে অনাহুত চক্র) গলায় এসে (বিশুদ্ধ চক্র) সে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়। দীক্ষা মন্ত্র ও মন্ত্র জপ সাধনা হিন্দু ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ যা অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। রামঠাকুর এটাকেই সহজ করে দিয়েছেন। তার সাধনা চেতন— অবচেতন— অতিচেন— বিশ্বচেতন এই ধারায়।

বৈদিক মন্ত্র পৌরাণিক ভক্তিধর্মের প্রেমরসে জারিত হয়ে ধর্মকে সহজসাধ্য করেছে, মরমিয়া করেছে। চৈতন্য-রামানুজ-তুকারাম-নামদেব-একনাথ-কবীর-শঙ্করদেব এই ধারার প্রবর্তক। পরবর্তী যুগে শ্রীরামঠাকুর এই পথের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। কারণ এই ধারার অন্যান্য সাধক যাঁরা ছিলেন যেমন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সন্তদাস কাঠিয়াবাবা, নিগমানন্দ সরস্বতী প্রমুখ আচার্য আহার বিষয়ে অত্যন্ত বিধিনিষেধ আরোপ করতেন। আবার শ্যামাচরণ লাহিড়ীর পরম্পরায় ক্রিয়াযোগ সাধনা সাধারণ গৃহী মানুষ করতেই পারবে না। বিবেকানন্দ পরবর্তী রামকৃষ্ণ মিশন যতখানি সমাজ সেবক ততখানি আধ্যাত্মিক নয়, সমাজজীবনে মিশন বহুক্ষেত্রে স্টেটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরাট দর্শন ও কর্মকাণ্ড, কিন্তু তাতে সাধনা ঠিক কতটুকু? আধ্যাত্মিকতা কতখানি?

শ্রীরামঠাকুর ধর্মকে আরো সহজ করে দিলেন। দিনে আধঘণ্টা সাধনাই যথেষ্ট। না পারলে ১৫ মিনিট হলেও চলবে যদি আন্তরিকতা থাকে। কোনো আহার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নেই। কোনো বৈষম্য নেই। ব্রাহ্মণ-খৃষ্টান সবাই পাশাপাশি বসে আহার করতে পারে এবং কোটিপতি ও ভিখারির একই মর্যাদা শ্রীরামঠাকুরের কাছে। এটা মানবসম্প্রদায় এবং মহত্তর জাতীয়তাবোধের সূচক যা একান্তই বৈদিক ভারতীয়।

মাধবেন্দ্রপুরীর তিনজন প্রধান শিষ্য ছিলেন— ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত আচার্য এবং অনঙ্গদেব। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ছিলেন চৈতন্যদেবের শিষ্য গোপাল ভট্ট, তাঁর শিষ্য ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য এবং শ্রীনিবাসের প্রধান শিষ্য ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। এই রামচন্দ্র কবিরাজ-ই পরজন্মে রামঠাকুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর অন্য শিষ্য অনঙ্গদেব প্রায় ৫০০ বছর দেহে ছিলেন। এই অনঙ্গদেবের প্রধান শিষ্য রামঠাকুর যিনি পূর্বজন্মে রামচন্দ্র কবিরাজ ছিলেন।

আমাদের দেশের সাধকদের মধ্যে কেউ কেউ কয়েকশো বছর ধরে বেঁচেছিলেন, এমন উদাহরণ অনেক আছে। যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী (৩০০ বছর), লোকনাথ ব্রহ্মচারী (১৬০ বছর), বরফানী বাবা (২৭০ বছর— আজো বেঁচে আছেন), ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী (৩৫০ বছর)। এমন উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠতম আধুনিক রূপকার শ্রীরামঠাকুর যিনি যুগ ও কাল প্রয়োজনে ধর্ম সাধনাকে আরো সহজ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পথ কোনো ব্যয়বহুল বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয়, শুধুমাত্র অতি সহজ নামজপের দ্বারা মানুষ তার ভেতরকে পরিষ্কার করতে পারে, পবিত্র করতে পারে এবং কোনো অর্থ ব্যয় না করে, শারীরিক পরিশ্রম না করে এই সাধনা করা যায় এবং আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছনো যায়। তাঁর প্রদর্শিত পথ সহজতম।

আধ্যাত্মিকতা ছাড়া দেহ-প্রাণ-মন শুদ্ধ ও পবিত্র হয় না। অশুদ্ধ চিত্তের মানুষ রিপুর অধীন। রিপুর অধীন মানুষ স্বার্থপর ও আত্মসুখ সর্বস্ব যারা সমাজকে কলুষিত করে। কলুষিত সমাজ মানব দেহে দানবকে লালন করে। দানব দেশকে বিপন্ন করে। নেহরু-ইন্দিরা- সোনিয়া জমানা, হয়ে সিপিএম জমানা, তৃণমূল কংগ্রেস জমানা তার উদাহরণ।

বৈদিক ও উপনিষদের জ্ঞানযোগ এবং ধ্যানযোগ, তন্ত্রের হঠযোগ, রাজযোগ, পৌরাণিক যুগের ভক্তিযোগ ও পরবর্তী যুগের কর্মযোগ— এই হলো ভারতীয় যোগ সাধনার পরম্পরা। যদিও কয়েক হাজার বছর আগে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এদের প্রথম ও প্রায়োগিক সমন্বয় করেছিলেন যা পরবর্তী সময়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম যেহেতু বিশেষ এক বা একাধিক ব্যক্তি কিংবা গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে না অন্য সব ধর্মগুলোর মতো, তাই বারবার হিন্দুধর্ম বেঁচে ওঠে সনাতন চলমানতায়। শ্রীরামঠাকুরের জীবনের দু'দশক কেটেছে হিমালয়ে। অনেক বছর কেটেছে তিব্বতের জ্ঞানগঞ্জে, কৌশিক ও যোগেশ্বরী আশ্রমে, কুমায়ুনের দুনাগিরি পাহাড়ে, গাড়োয়াল হিমালয়ে, মধ্যপ্রদেশের শাক্ত ও শৈব তীর্থে, বৃন্দাবনে ও দক্ষিণ ভারতে সাধক ও পরিব্রাজক রূপে প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে। এত বিস্তৃত হিমালয় পরিব্রাজক জীবন অন্য কারুর নেই, এমনকী শঙ্করাচার্য বা বিবেকানন্দের জীবনেও এতো ব্যাপক ও দীর্ঘ পরিব্রাজন নেই। ভারত পথিক বলেই তিনি জাতীয়বোধ সম্পন্ন।

শ্রীরামঠাকুর বৃহত্তম ভারতপথিক ভূগোল ও ইতিহাস দু'দিক থেকেই। তাঁর আত্মানুসন্ধান, আত্মআবিষ্কার, ভারত অনুসন্ধান, মানবকল্যাণ ও অকাতরে প্রেম বিতরণ একই সঙ্গে আবর্তিত হয়েছে বলেই শ্রীরামঠাকুর হলেন চৈতন্য-নানক-কবীর-শঙ্করাচার্য-বিবেকানন্দের সংযুক্তিকরণে নির্মিত এক মহতী দিব্যমূর্তি। শ্রীরামঠাকুর ৩৫ বছর ধরে আসমুদ্র হিমাচল ঘুরেছেন। তিব্বত সহ বহু 'অগম্য' স্থানে সাধনা যা তাঁকে মানবপ্রেমী মহাসাধক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মহাগুরুতে পরিণত করেছে। ধর্মসাধনাকে এতো সহজ, এতো সরল, এতো মধুর, এতো মানবিক, আরো সহজগম্য অন্য কোনো মহাপুরুষ ঐতিহাসিক যুগে করে যাননি। ভারতপথিক বলেই তিনি জাতীয়তাবোধের মূর্ত বিগ্রহ যা রাজনৈতিক জাতীয়তা নয়; সামাজিক জাতীয়তা যা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। তিনি জাতীয় অগ্রাভিযানের নায়ক। ■

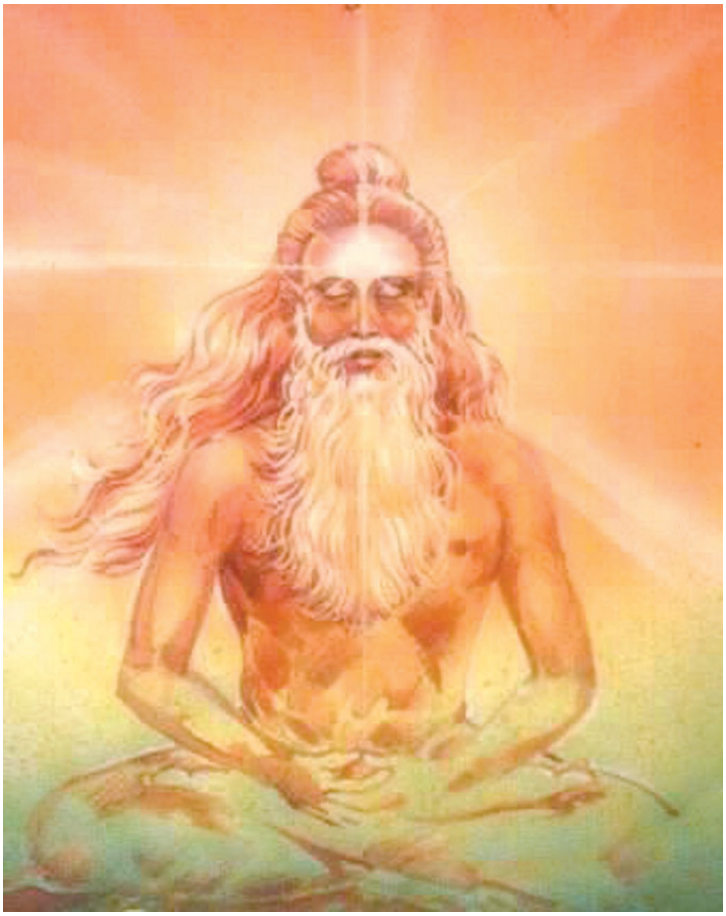

ধ্যানের শ্রেণীবিভাগ

রবীন সেনগুপ্ত

ধ্যান বা মেডিটেশান একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান। এটি সাধারণ জড় বিজ্ঞানের অন্তর্গত নয়। এই জাতীয় বিষয়গুলি অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বা স্পিরিচুয়াল সায়েন্সের পর্যায়ে পড়ে। ধ্যানের উপযোগিতা— ইট, কাঠ, কংক্রিট, টেস্টটিউব-যুক্ত ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করা যায় না। এটি মানব মনের ল্যাবরেটরিতে, সমাজের ল্যাবরেটরিতে যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত।

বাইরে থেকে দেখলে সকল প্রকার ধ্যানকে একই রকম মনে হতে পারে। সব ধ্যানই মেরদণ্ড সোজা রেখে আসনে বসে নিমীলিত চক্ষে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ধ্যানের মন্ত্র, পরিবেশ, ধ্যানের সময়, চিন্তার বিষয় অনুসারে ধ্যানের নানা প্রকার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বিপুল আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠ্য বিষয় ও গবেষণালব্ধ বস্তুগুলি নিয়ে চিন্তনযুক্ত মন্ত্র ধ্যান করে যেতে হয়। তাতেই ধ্যানী ব্যক্তির মানসপটে নানা সিদ্ধান্ত এসে উপস্থিত হয়। সেগুলির সাহায্যে তাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে থাকেন। মহর্ষি বেদব্যাস— জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ ধ্যানের মাধ্যমে অনুভূতি প্রাপ্ত হয়েই গীতা, ভাগবত, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, বেদান্ত সূত্র ও মীমাংসা শাস্ত্র রচনা করে অমর হয়ে আছেন। তার জন্য তাঁকে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সেগুলিকে সুসংহত করতে হয়েছিল ধ্যানের মাধ্যমে।

শূন্যে ভাসা, জলের উপর দিয়ে হাঁটা, শরীরকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ করে তোলার জন্য যে ধ্যান রয়েছে— তার নাম অষ্টাঙ্গ যোগধ্যান। এটি খুবই বিপজ্জনক ধ্যান। পাহাড়ের গুহায় নিভৃতে বছরের পর বছর ধরে অনাহারে অর্ধাহারে এই প্রকার ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। এতে অনিমা, লঘিমা, প্রকাশ্য ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞান এতে নাও লাভ হতে পারে। অনেক অসুরই এই ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করে মূর্খের মতো তা অনাসৃষ্টিকর কর্মে ব্যবহার করে আসছে যুগ যুগান্ত ধরে। তবে এই প্রকার ধ্যানের শেষে ক্ষমতা লাভের পর তা সৎ কার্যে ব্যবহার করলে সেটাকে দৈব-অষ্টসিদ্ধি ধ্যান বলে। আর ক্ষমতাকে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগালে তাকে আসুরিক অষ্টসিদ্ধি ধ্যান বলা হয়।

মহিলাদের নিয়ে, তাদের তান্ত্রিক উপাচার দ্বারা পূজা করার পর যে ধ্যান— সেটি হলো বামাচার ধ্যান। বামাচার থেকে প্রায়শই অনাচার ও ব্যভিচার উৎপন্ন হয় বলে ভদ্রজনেরা এ জাতীয় ধ্যান এড়িয়েই চলেন।

অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করার জন্য যে ধ্যান রয়েছে তাকে বলা হয় তুরীয় ধ্যান বা ট্রান্সসেনডেন্টাল মেডিটেশান। শ্রী মহেশ যোগী এই প্রকার ধ্যান শিক্ষাদানের জন্য পশ্চিমি দেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সাধারণভাবে গৃহে বসে ভগবান বিষ্ণু, শিব ও মা মহামায়ার যে ধ্যান করা হয় সেগুলিকে যথাক্রমে বৈষ্ণব ধ্যান, শৈব ধ্যান ও শাক্ত ধ্যান বলা হয়। এতে অষ্টসিদ্ধি লাভ না হলেও কিছু কিছু ক্ষমতা লাভ হয়ে থাকে।

পিশাচ ও প্রেতদের বশ করার জন্য বিশেষ প্রকার তান্ত্রিক ধ্যানকে পিশাচ সিদ্ধি ধ্যান ও প্রেত সিদ্ধি ধ্যান বলে। বিপজ্জনক এই ধ্যানগুলি গভীর রাতে শশ্মানে বসে করতে হয়। আর মায়ামোহ ভোগবাসনা একেবারে দূর করে ব্রহ্মে লীন হওয়ার ধ্যানকে বলে কৈবল্য ধ্যান। ■

বাঘের ছাল

বিরাজ নারায়ণ রায়

ছুটির দিন। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বসার ঘরে আমরা ছোটরা অলোকেশ জেঠুকে ঘিরে বসেছি, গল্প বলতে হবে। জেঠুকে বড়োরা সবাই দাদা বলে ডাকে তাই উনি আমাদের সবার জেঠু। এক সময় তিনি নাকি সাংবাদিকতা করতেন। দেশের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফলে তাঁর অনেক গল্প জানা। তাই আমরা সুযোগ পেলেই জেঠুর কাছে বসে যাই গল্প শুনতে। আজ আমাদের আবদার শুনে জেঠু বললেন— ঠিক আছে, আজ তোদেরকে একটা উত্তরবঙ্গের গল্প বলি।

আমরা সবাই হই হই করে উঠলাম— বল বল বল।

জেঠু গল্প শুরু করলেন— সে অনেকদিন আগের কথা, আমি তখন যুগান্তর কাগজে কাজ করি। অফিস থেকে আমাকে বলা হলো উত্তরবঙ্গে যেতে হবে একটা খবরের বিষয়ে তদন্ত করতে। আগে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু তেমন বেড়ানো হয়নি। আমি তো মহাখুশি, কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে আর একবার বেড়ানোটাও হয়ে যাবে। দেরি না করে আমি পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম। শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে সোজা এনজেপি, তারপর সেখান থেকে নকশালবাড়ির একটি গ্রামে। ওখানে পৌঁছে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি, খবর সংগ্রহ, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলা এইসব করে সারাদিন কেটে গেল। এদিকে যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে তা খেয়ালই করিনি। জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম। যাতায়াত ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আর রাতের বেলা তো কোনো কথাই নেই, গ্রামের কেউ ঘর থেকেই বেরোয় না। আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম এখন কী হবে, ফিরবো কী করে? শিলিগুড়ি পৌঁছোতে পারলে তবেই কোনো অতিথিশালায় থাকা যাবে।

আমার এই অসহায়তার কথা গ্রামের লোকদের বললাম। একজন বলল— রাতে বেরনো মোটেই নিরাপদ নয়।

সন্ধ্যে হলেই এখানে বাঘ বেরোয়।

আমি কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। তখন বৃদ্ধ গোছের একজন লোক এগিয়ে এসে বললেন— আজ রাতটা তুমি আমাদের বাড়িতে থেকে যাও। কাল সকালে যেও।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। যাক মাথা গোজার একটা ঠাঁই তো হলো। বৃদ্ধ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা মাত্র লম্ফ জ্বলছে। জঙ্গলের মধ্যে তিনখানা ছোট ছোট ঘর। একটা শোবার ঘর, একটা রান্নঘর, একটা গোয়ালঘর। বাঁশের বেড়া, খড়ের ছাউনি। আমি ভাবলাম, সে যাই হোক এখানে থাকলে তো কমপক্ষে বাঘের পেটে যেতে হবে না।

বৃদ্ধ ঘর থেকে একটা আসন নিয়ে এসে আমাকে বসতে দিলেন। বসেই মনে হলো আসনটা বেশ নরম। অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না তাই কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম— এটা কিসের আসন?

বৃদ্ধ বললেন— বাঘের ছালের আসন।

শুনেই আমি তড়াক করে উঠে পড়লাম। দেখলাম সত্যিই তো তাই। ওখানকার লোকেরা খুব অতিথিবৎসল হয় শুনেছি। এবার তা বুঝতে পরলাম। একটু পরেই রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গেল। খুব সাধারণ খাবার। এতো তাড়াতাড়ি ঘুমোনো অভ্যেস নেই, তাই বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প করতে বসলাম। বাঘের ছালে বসার পর থেকে আমার মাথায় ওটাই ঘুরছে। তাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম— আপনি ওই বাঘের ছাল কোথায় পেলেন?

বৃদ্ধ একটু হেসে বললেন— একটা বাঘের গা থেকে আমিই ওটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম। শুনে আমি তো থ! বললাম— কীভাবে?

তিনি তখন বললেন— জোয়ান বয়সে অনেক বাঘ মেরেছি। একবার হলো কী একটা বাঘ আমাদের গোয়ালঘরে এসে হামলা করল। আমিও ছাড়ার পাত্র নই। বড় একটা কুড়ুল নিয়ে বাঘের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঘ আমাকে দেখছে, আমি বাঘকে দেখছি। এই করতে করতে বাঘ আমার দিকে

লাফিয়ে পড়লো আর আমি বাঘের মাথায় দিলাম এক কোপ বসিয়ে। অমনি আর যায় কোথায়! বাঘটি পিছন ফিরে বাঁশের বেড়া ভেঙে পালাতে লাগলো। আমিও দৌড়ে গিয়ে বাঘের লেজটা টেনে ধরলাম। আমার গায়ে তখন বেশ জোর ছিল। বাঘ একদিকে টানছে, আমি একদিকে টানছি। এদিকে বাঘের কপালে যেখানে কুড়ুল বসিয়েছিলাম সেই চামড়া ফাটতে ফাটতে বড় হচ্ছে। তারপর এক সময় বাঘটা হুশ করে বেরিয়ে চলে গেল, আর চামড়াটা আমার হাতে থেকে গেল।

বৃদ্ধের কথা শেষ হলো, এই ছিল সেই বাঘের চামড়ার কাহিনি। অলোকেশ জেঠু একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন— এমনিতেই ভয়ে ভয়ে ছিলাম, এই ঘটনা শুনে তা আরও বেড়ে গেল। কোনো রকমে সেই রাতটা ওখানে কাটালাম। তারপর সকাল হলে একটুকুও দেরি না করে চম্পট দিলাম, শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন ধরে সোজা কলকাতা।

এতদূর বলে অলোকেশ জেঠু তাঁর গল্প থামালেন। আমরা এতক্ষণ সব হাঁ করে শুনছিলাম। আমাদের মধ্যে ভোল্টন একটু বেশি পাকা। সে বলল— জেঠু তারপর সেই বাঘটার কী হলো? জেঠু ভোল্টনের দিকে তাকালেন। মুখ দেখেই মনে হচ্ছে প্রশ্নটা তাঁর মোটেই পছন্দ হয়নি। একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন— তুই দেখি কিছুই জানিস না। বাঘটার আবার কী হবে, ওর আবার নতুন চামড়া গজিয়েছে।

মনীষী কথা

মেঘনাদ সাহা

একজন প্রথিতযশা বাঙালি বিজ্ঞানী হলেন মেঘনাদ সাহা। ঢাকা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে শেওড়াতলী গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর। পিতা জগন্নাথ সাহার পঞ্চম সন্তান মেঘনাদ। দারিদ্র্য সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনায় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। আই এস সি পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে তিনি এম এস সি পাশ করেন।

মেঘনাদ সাহার জীবনে একটা বড়ো প্রভাব ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি মেঘনাদ সাহাকে বিজ্ঞান কলেজে প্রথমে গণিত বিভাগে লেকচারার ও পরে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে নিয়োগ করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গবেষণা 'তাপিয় আয়নন তত্ত্ব'। বর্তমান 'সাহা ইনস্টিটিউট ও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। মেঘনাদ সাহার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কার। আমাদের পঞ্জিকার ভুলত্রুটিগুলি তিনি পরিমার্জন করেন। ভারতীয় জোতির্বিজ্ঞানের একজন পুরোধাপুরুষ ছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।

প্রশ্নবাণ

১. বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্ম কোথায় হয়েছিল?
২. সেরা অভিনেতা হিসেবে এবছর কে অস্কার অ্যাওয়ার্ড পেলেন?
৩. 'পথের পাঁচালী' ছবিতে অপুর গ্রামের নাম কী?
৪. নিউটনের পোষ্য কুকুরটির নাম কী ছিল?
৫. শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ কোন্ জেলায়?

উত্তর : ১. জার্মানির উম শহরে। ২. লিওনার্দো দি ক্যাপ্রিও। ৩. নিশ্চিন্দিপুর। ৪. ডায়মন্ড। ৫. মুর্শিদাবাদ।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	সঠিক ভাবে সাজাতে হবে
(১) অ হ গ স	(১) দা থ র কে না
(২) লী ম বি শা	(২) কে ত্র্য শ্ব র স্ব

২৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর	২৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) রন্ধনশালা (২) তালপুকুর	(১) মালাবদল (২) গীতিআলেখ্য

উত্তরদাতার নাম

(১) দেবারতি দাস, জয়নগর দ: ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

নারী স্বাবলম্বীকরণের পথে

কুনোয়ারবাঈকে প্রণাম করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সুতপা বসাক ভড়

নারী স্বাবলম্বীকরণের পথে অগ্রগামী কয়েকজন মহিলার কীর্তি সমাজে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে।

মেয়ে জন্মালে গাছ লাগাও— দক্ষিণ রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলার অন্তর্গত সবুজে ঢাকা একটি গ্রাম পিপলন্তরী। এখানকার গ্রাম-পঞ্চায়েত নবজাত শিশুকন্যাকে বাঁচাতে আর গাছ-পালা বাড়ানোর জন্য একটি সুন্দর উপায় বের করেছে। এই গ্রামে কোনো পরিবারে কন্যা-সন্তানের জন্ম হলে আনন্দের প্রকাশস্বরূপ তারা ১১১টি গাছ লাগায়। মেয়েটি এবং গাছগুলি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেখাশুনার দায়িত্বও নেয় ওই পরিবারটি। এইভাবে গত ছ'বছরে গ্রামবাসীরা প্রায় আড়াই লক্ষ গাছ লাগিয়েছে। প্রতি বছর এই গ্রামে গড়ে প্রায় ৬০টি মেয়ের জন্ম হয়। গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা, পঞ্চায়েত এবং অঙ্গনওয়াড়ির সদস্যরা একটি সমিতি তৈরি করে এই পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে থাকেন। এছাড়া, ২১ হাজার টাকা গ্রামবাসীরা চাঁদা তোলে এবং ১০ হাজার টাকা মেয়েটির বাবার থেকে নিয়ে কন্যাসন্তানের নামে মোট ৩১ হাজার টাকা ২০ বছরের জন্য জমা রাখা হয়। এক্ষেত্রে, মেয়েটির মা-বাবাকে একটি শপথপত্রও পূরণ করতে হয় যাতে লেখা থাকে সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত তারা মেয়েটির বিয়ে দেবে না, নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাবে এবং ওই গাছগুলোর দেখাশুনা করবে। গ্রামবাসীরা এইরকম সৎ উদ্দেশ্যে লাগানো গাছগুলির চারপাশে ২৫ লক্ষ ঘৃতকুমারী চারাও লাগিয়েছেন— যা বেশ কিছু পরিবারের উপার্জনের স্রোত হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

স্বচ্ছতা মানেই বাড়িতে শৌচালয়— ওড়িশা রাজ্যের পুরী জেলার নীমাপাড়া ব্লকের অন্তর্গত ছোট্ট একটি গ্রাম সগাড়া। এই গ্রামের চুয়াল্লিশ বর্ষীয়া কবিতা নায়ক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার প্রতি জনগণকে সচেতন করার জন্য বিশেষভাবে পরিচিতা। ১৯৮৫ সালে খুবই কম বয়সে বিয়ে হয়ে এই গ্রামে আসেন কবিতা। ওই সময় গ্রামটিতে কোনো বাড়িতে শৌচালয় ছিল না। অগত্যা সবাই শৌচকর্মের জন্য মাঠে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। কবিতার বাবা সরকারি চাকরিসূত্রে যেখানে গেছেন, সরকারি আবাসেই থেকেছেন। সেখানে শৌচালয় ছিল। শৌচালয় ব্যবহারে অভ্যস্ত কবিতার শ্বশুরবাড়িতে ভীষণ অসুবিধা হোত। নতুন বউ কবিতা শাড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে 'বাইরে' যেতেন। খুবই লজ্জার ব্যাপার ছিল তাঁর কাছে। দিনের পর দিন ঠিক করে খাবার খেতেন না, যাতে 'বাইরে' যেতে না হয়। এইভাবে একবছর ভীষণ কষ্ট করে কাটাবার পর কবিতা তাঁর শ্বশুরমশাইকে ছোট্ট একটি শৌচালয় তৈরি করতে রাজি করায়। গ্রামবাসীদের শৌচালয় ব্যবহারের সুবিধার কথা বলায় তারাও নিজের নিজের বাড়িতে শৌচালয় বানাতে আরম্ভ করে। এব্যাপারে কবিতা কোনো সরকারি সাহায্য পাননি। শেষে ২০১১ সালে ইউনাইটেড আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এই সংস্থাটি পুরী জেলায় খোলা জায়গায় শৌচকর্ম বন্ধ করার জন্য ওয়াটার এড ইন্ডিয়ার সঙ্গে মিলে কাজ করছিল। এদের সাহায্য নিয়ে গ্রামবাসীদের উন্নয়নে তিনি গ্রামে একের পর এক শৌচালয় নির্মাণ করিয়েছেন। বর্তমানে ওই গ্রামে ১১৬টি বাড়িতে শৌচালয় রয়েছে।

ছাগল বিক্রি করে শৌচালয়— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডোঙ্গরগড়ের ১০৪ বছর বয়স্কা কুনোয়ারবাঈয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। এই মহিলা ছাগল বিক্রি করে নিজের বাড়িতে শৌচালয় বানিয়েছেন এবং গ্রামবাসীদেরও স্বচ্ছতার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডোঙ্গরগড়ের এক জনসভায় কুনোয়ারবাঈ-য়ের উল্লেখ করে বলেন যে, ১০৪ বছরের মা কুনোয়ারবাঈ-য়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি এও বলেছেন যে, যারা নিজেদের প্রগতিশীল বলে মনে করেন, তাঁরা ঠিক করুন সত্যিই কি তাঁরা প্রগতিশীল? ১০৪ বছরের এই বৃদ্ধা মহিলা টিভি দেখেন না, লিখতে পড়তেও জানেন না, কিন্তু যখন জানতে পেরেছেন যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বারবার শৌচালয় বানাতে এবং ব্যবহার করতে বলেছেন, তখন তিনি ছাগল বিক্রির টাকা জমিয়ে নিজের বাড়িতেই শৌচালয় বানিয়েছেন এবং গ্রামবাসীদের সামনে একটি উৎসাহমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই ঘটনাগুলির প্রেরণাদায়িনীরা কেউ-ই খুব বিখ্যাত বা বিরাট ব্যক্তিত্ব নন, তাঁরা সবাই সাধারণ মানুষ, কিন্তু অসাধারণ তাঁদের চিন্তাধারা ও দৃঢ় সংকল্প। সেজন্য আজ তাঁরা আমাদের প্রেরণাদাত্রী। এরকম আরও অনেক মহিলা আছেন যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে এগিয়ে চলেছেন এবং সমাজ ও দেশের মঙ্গলসাধন করছেন। তাঁরা সত্যিই প্রণম্য। ■

কানহাইয়া কুমারের শ্রীকৃষ্ণের অনাসক্তির উপদেশ ভেবে দেখা উচিত

অতিথি কলম

বাচি কারকারিয়া

একটি বিতর্কিত স্লোগান আর একটা আলটপকা 'টুইট', এই ছিল যথেষ্ট। রাতারাতি এক অখ্যাত ছাত্র ১নং গণশত্রুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এর পরই একটা সোজা একপেশে বক্তৃতা। সেই গণশত্রুই শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতির রূপ নিল। সেই হয়ে গেল দেশের হিরো নং ওয়ান। অবশ্যই এই ধূমকেতুর মতো উত্থানে যে কারুরই মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। কানহাইয়া কুমারের মাথা এখনও পর্যন্ত অবশ্য তার দেহের ওপরই দৃশ্যমান! তবুও রাত ফুরতে কেষ্ট বিষ্টু হয়ে যাওয়ার সঙ্গী যে মায়াবী হাতছানি তাকে বিশ্বাস করা সঠিক নাও হতে পারে।

অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষও এই হঠাৎ প্রসিদ্ধির কুখ্যাত কুহককে অনেক সময়ই এড়াতে পারেননি। সাফল্যের এই ছলনাময়ী দেবী অনেক সম্ভাবনাময়কেই হাউই-য়ের মতো ধ্বংস করে ফেলেছেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় অনেক অপাপবিদ্ধই কালক্রমে মধ্যবয়সের শঠতায় আক্রান্ত হয়েছেন যাকে রাজনৈতিক অনৈতিকতাও অনায়াসে বলা যায়। আমার মনে হয় তার একদিনের প্রচারিত বাগ্মিতার মাধ্যমে সে যে পরিমাণ শত্রু তৈরি করেছে তাদের থেকেও কিন্তু বেশি সতর্ক থাকা উচিত তার বক্তৃতা-সৃষ্ট শুভানুধ্যায়ীদের সম্পর্কে।

বাস্তবে যারা তার দিকে বন্দুক তাক করছে তাদের থেকে স্তোকবাক্য প্রদানকারীরা হয়ত তার আদর্শগত উন্মাদনকে কৌশলে অন্তর্ঘাত করে নিজেদের দিকে ঝোল টেনে নিতে পারে। কানহাইয়ার বক্তৃতায় রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তার জন্য নানান ফাঁদও অপেক্ষা করে আছে। যেমন কানহাইয়া হয়ত তার হঠাৎ অর্জিত তুমুল প্রশংসার পাহাড়ের ওপর চুপচাপ বসে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত এমনটাও হতে পারে যে, এই গগনচুম্বী মাতামাতির ফলে সে এমন একটা মানসিক স্বর্গে বাস করতে লাগল যেখানে সে তার নিজের রাজনৈতিক বিবেকের ডাকও আর শুনতে পাবে না। আমি সেই অন্যমতাবলম্বীদের কথা বলছি, যাদের কণ্ঠ বরাবরই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে বা শুনেও অবহেলা করা হয়েছে বা আদৌ কানে পৌঁছয়নি। সেই সম্মিলিত অপরিচিত কণ্ঠস্বরের ঐক্যতানই তো তার যোগাযোগ কাঠামোর ওপর ভর করে লোকের কানে পৌঁছেছিল।

বাস্তবে ছাত্র সংগঠনের একজন নেতা বিশেষ করে যদি সে আবার জে এন ইউ-এর মতো জায়গার হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থান অনিবার্য। আর ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্তর্জলি যাত্রায় যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। আঁকড়ে ধরেছে তাকে আধমরা 'লাল আশাকে' মৃত-সঞ্জীবনী প্রয়োগের বাসনায়। কানহাইয়ার পায়ে ধরেছে তারা পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে যদি সে তাদের মৃতপ্রায় বামপন্থী দলগুলির মধ্যে প্রচারের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চার করতে পারে। কিন্তু কানহাইয়ার নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য বা সংহত করার জন্য সময় নেওয়া উচিত। সংসদীয় রাজনীতিতে একবার ঝাঁপ দিলে তার অবশ্যম্ভাবী খাপ খাইয়ে চলা আর নীতিভ্রষ্ট হওয়া কেউ ঠেকাতে পারে না। ঠিক এই আপৎকালীন মুহূর্তেই কানহাইয়ার উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে বলা বাণী স্মরণে আনা যা হলো 'অনাসক্ত' থাকার উপদেশ। এমনকী এই অনাসক্তি তার শুভানুধ্যায়ী পরিমণ্ডলের বাহিনীদের কাছ থেকেও নিতে হবে। আর অনসক্তি সঞ্জাত সংহতি থেকেই আসবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য মনোনিবেশ।

এখন দেখা দরকার তার জেল ফেরত বক্তৃতার কিছু কিছু আক্রোশপ্রসূত নয় এমন বিষয়গুলি। অথচ সেগুলি মোটেই অপরিচিত নয় যেমন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ইত্যাদি থেকে 'আজাদি'। সেই সঙ্গে শাসনরত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ। এখানে তার বিষয়গুলি খাঁটি হলেও সে সুবিধেজনকভাবে ভুলে গেছে তার উত্থাপিত বিষয়গুলির জন্ম সময় মোটেই ২০ মাস নয়। বিষয়গুলি অর্ধশতাব্দীর প্রায় বার্ধক্যে আক্রান্ত। তার ৫০ মিনিট ধরে দেওয়া আকর্ষক বক্তৃতায় জে এন ইউ-কে সঠিক পথে আনার বিধানগুলি নেহাতই মেটো।

হ্যাঁ, তথাকথিত কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করা উদারবাদীদের মতলবি প্রতিবাদের চেয়ে তার ভিন্নমত পোষণ করার আহ্বান কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। অন্যদিকে, তার সতীর্থ এবিভিপি-র সদস্যদের প্রতি তার তাচ্ছিল্য মোটেই হবু রাজনীতিকের সম্ভাবনাময়তার বাহক নয়।

কানহাইয়া অত্যন্ত কৌশলে অনেকটাই আপ দলের রাস্তা ধরে ব্যক্তি আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী যে তড়িদ্‌প্রভা বাগ্মিতায় দেশবাসীকে মুগ্ধ করে এক অবিস্মরণীয় নির্বাচনী ফলাফল এনেছিলেন, সেই আসমুদ্র হিমাচল মন্থন করা কাহিনির সঙ্গে এর তুলনা কিছু কিছু সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক ভাষ্যকার করছেন, তবে তা নেহাতই অন্তঃসারশূন্য। হ্যাঁ, কানহাইয়া যে একজন উচ্চস্তরের বাগ্মী তার পর্যাপ্ত প্রমাণ সে রেখেছে। সে জানিয়েছে সে অধ্যাপক হতে চায়, রাজনীতিক নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঝানু পেশাদারি রাজনৈতিক বাহিনী তার গায়ে কট্টর বামবাদী গন্ধ পাওয়ায় তার পেছনে জড়ো হচ্ছে।

মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধনতন্ত্র তার নিজের অন্তরেই পুঁজিবাদ ধ্বংসের বীজকে লালন করে। অচিরেই সে ধ্বংস হয়। ঠিক এই ডায়লেকটিকটি নব উদ্ঘাটিত কানহাইয়ার ক্ষেত্রেও বেশ খাপ খেয়ে যায়। একটি বক্তৃতার পরেই যেন অভিভূত বিমুগ্ধকর প্রক্রিয়ায় এক নতুন মহাবিপ্লবীর আবির্ভাবের সূচনা সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। তার পরিণতিতে একদল পচধরা লোকের পরিত্যক্ত রাজনীতির মরা নদীতে তাকে হয়ত জোর করে ডুবিয়েই দেওয়া হবে। তবে এর আগে দরকার তার তীব্র আক্রামণাত্মক বক্তৃতার প্রতিটি ছত্রের অন্তর্নিহিত অর্থের পূর্ণ ছানবিন। সব চেয়ে বড় নিরীক্ষণ হওয়া উচিত ভবিষ্যৎ দিনে তার রাষ্ট্রীয় বিশ্বস্ততা। ■

With Best
Compliments
from -

A
Well Wisher

B.M.

দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই এদেশে কমিউনিস্টদের আসল পরিচয়

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

'আফজলগুরু অমর রহে', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'— এই স্লোগানগুলি যিনিই দিন, তিনি একজন ভারতীয় হতে পারেন না। 'আজাদ কাশ্মীরের' দাবিতে কিংবা 'একজন ইয়াকুব মারা গেলেও লক্ষ লক্ষ ইয়াকুব জন্ম নেবে'— পাক মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গিরাই এসব পোস্টার লাগায়। কিন্তু না, এবার দেশে এসব জয়ধ্বনি আর পোস্টার সাঁটার কাজ করছে ভারতের কিছু নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বামপন্থী ছাত্র-সংগঠন। নাগরিক সমাজের বহু মানুষ হতবাক হয়ে যাচ্ছেন— বামেদের এমন চরিত্র তো আগে জানা ছিল না! অন্যদিকে কমরেডরা জোর গলায় বোঝাতে চাইছে যে পাকমদতপুষ্ট জঙ্গিদের কাজকারবারকে সমর্থন করা বা আজাদ কাশ্মীরের দাবি তোলাটা মোটেই দেশবিরোধিতা নয়। এটা বরং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার— মত প্রকাশের স্বাধীনতা। অবাক হবার কিছু নেই। এটাই এদেশে বামপন্থীদের আদি ও অকৃত্রিম চরিত্র। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই এদেশে কমিউনিস্টদের আসল পরিচয়। কিছুদিন আগে পাকিস্তানে ভারতের পতাকা ওড়ানোর অপরাধে এক মুসলমান যুবকের দশ বছর জেল হয়। ভারতের অলিতেগলিতে হামেশাই পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। তার জন্য ভারতে সাজা হবার কোনো রেওয়াজ নেই। এযাবৎ শাসকদল এসব কাজকে মেনে নিয়েই দেশ শাসন করে এসেছে।

ইসলামি শক্তি ও কমিউনিস্টদের মধ্যে আদর্শগত কিছু ফারাক থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এই দুয়েরই উদ্দেশ্য হুবহু এক— ভারত বিদ্বেষ। এদেশে কমিউনিস্টদের একমাত্র কাজ হলো ভারতবর্ষ সম্পর্কে মানুষের মনে বিকৃত ধারণা তৈরি করে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো। একাজে মোল্লাতন্ত্র না কমিউনিজম, কে কাকে ব্যবহার করে তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এদের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে বার বার একথাই প্রমাণিত হয় যে এরা দুজনে হাত ধরাধরি করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে খতম করার খেলা খেলে আসছে।

স্বার্থসিদ্ধির জন্য বামপন্থীরা সবসময় সুবিধাবাদী নীতি নিয়ে থাকে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাদের অবস্থান হলো— 'ধর্ম জনগণের আফিম', আবার মুসলমান ধর্মান্ধতা সম্পর্কে তারা বরাবর নির্বাক। হিন্দুদের পুজো-পার্বণ তারা সচেতনভাবে এড়িয়ে যায়, আবার ঈদ- ইফতারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করতে হিন্দু কমরেডরা ফলাও করে গো-মাংস খায়, মুসলমান কমরেডরা কিন্তু শুয়োরের মাস খায় না। তাদের এই ভণ্ডামি দেখে দেশের মানুষ আর অবাক হন না। এদেশের নাগরিক হয়েও যেমন মুসলমানদের আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তা আরব দুনিয়ার নির্দেশে চলে, তেমনি এদেশের কমিউনিস্টরা চীন-রাশিয়ার অনুকরণ ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। একটা চালু কথা আছে যে, মস্কো বা চীনে বৃষ্টি হলে এদেশের বামপন্থীরা ছাতা খোলেন। পন্থ-নিরপেক্ষ (রাষ্ট্র কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে

পি সি যোশী

কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশী স্যার রেজিনাল্ড-এর কাছে আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন যে তিনি ও তাঁর দল ভারতছাড়ো আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে কী চমৎকার কাজ করেছেন। বৃটিশের কাছে সিপিআই-এর গুরুত্ব প্রমাণ করতে যোশী তৎপর হয়ে উঠেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করে আর সুভাষ বোস-সহ কংগ্রেস নেতাদের তীব্র ভর্ৎসনা করে তাঁরা তাঁদের গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

না) ভারতে বিশৃঙ্খলা তৈরির মূলে যে চীন-পাকিস্তানের অশুভ আঁতাত রয়েছে সে বিষয়ে বামেরা কখনো মুখ খোলেন না। বস্তুত, অভিন্ন জাতীয়তাবোধের কোনো ধারণাই তারা স্বীকার করেন না। তাদের কাছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদ, আর চীন-রাশিয়ার জাতীয়তাবাদ হলো সর্বহারার জাতীয়তাবাদ। ফলত হিন্দুদের ঘৃণা করা আর জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রতিপক্ষ তৈরি করে তাকে লাগাতার আক্রমণ করে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য। পরিস্থিতি অনুযায়ী ভোল বদল করতে অভ্যস্ত হলেও, এই নীতি তারা সমানভাবে অনুসরণ করে আসছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদ আখ্যা দিয়ে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছিল।

মুখে সামাজিক সাম্যের কথা বলা আর একবার ক্ষমতা পেলে বিরোধীদের নিকেশ করা— এটাই কমিউনিজমের বাস্তব রূপ। মার্কসবাদে কোথাও চিন্তার ন্যূনতম স্বাধীনতা নেই, অথচ তারাই গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলে। তাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তারা হিংসার আশ্রয় নিতে পিছপা হয় না। 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হলেও গত আট দশকে তারা দেশে কোনোও সর্বহারাকে নেতা বানায়নি। ভারতের গৌরবের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এরকম কিছু অল্পসংখ্যক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ কমিউনিস্টদের নেতা হবার যোগ্য বিবেচিত হন। পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিজম ব্যর্থ হয়েছে, তবুও বিভাজনের রাজনীতিতে ভর করে বামপন্থীরা এদেশের রাজনীতিতে শেকড় গেড়ে বসার দুরন্ত স্বপ্ন দেখেনে। একইভাবে মুসলমানরাও ভারতে মুসলমান যুগ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশাবাদী। প্রয়াত ড. সৈয়দ মামুদ, যাঁকে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, ''এটা সবাই ভালোভাবে জানে যে হিন্দুরা এদেশে শাসন করতে অক্ষম। ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এদেশে মুসলমানরা ক্ষমতায় নেই বলে জাতি হিসেবে আমরা নীচে নেমে যাচ্ছি। এই দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে শুধু মুসলমানরাই রক্ষা করতে পারে।''

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে জন্ম নেওয়া ইস্তক কমিউনিস্টরা লাগাতারভাবে ইসলামি যুগের আগেকার ভারত সম্পর্কে মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে আসছে। ভারতে আর্যরা আক্রমণ করে দ্রাবিড়দের জোর করে উচ্ছেদ করেছে বলে মুষ্টিমেয় কিছু পশ্চিমি ঐতিহাসিক যে আজগুবি তত্ত্ব তৈরি করেছেন তার সঙ্গে কমিউনিস্টরা এদেশে মুসলমান আক্রমণের বিষয়কে এক করে দেখানোর চেষ্টা করে। সেইসব ইতিহাসকে হাতিয়ার করে তারা যুক্তি দেয় যে আরবীয়, তুর্কি, আফগান বা পারসীরা যেমন এদেশে বহিরাগত, তেমনি হিন্দুরাও এ মাটির সন্তান নয়, তারা আক্রমণকারী আর্যদেরই বংশধর। ভারতে মুসলমানদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ এবং তরবারি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাকে তারা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে। ভারতে নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানরা ভেঙে পড়া প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে নতুন জন্ম দিয়েছে বলে তারা প্রচার করে। এই সমস্ত বিকৃত ইতিহাস চেতনাই মুসলমানদের একটি আলাদা জাতীগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে প্রেরণা জোগায়। ভারতীয়দের অতিতকে কলঙ্কিত করতে বেদের যুগে হিন্দুদের মধ্যে গো-মাংস খাবার চল ছিল বলেও কমিউনিস্টরা প্রচার করে। আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের আপসহীন একটা মনোভাব তৈরি করতে এইসব হিন্দু-বিদ্বেষী তত্ত্ব দারুণভাবে কাজ করে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এম এন রায় মন্তব্য করেছিলেন যে ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের গোঁড়ামির কাছে অত্যাচারিত মানুষ এদেশে মুসলমান আক্রমণকারীদের সহায়তা করেছে আর ইসলাম তাদেরকে সামাজিক এমনকী রাজনৈতিক সমতা দেবার ফলে তারা ইসলামের ছাতার তলায় জড়ো হয়েছে। তিনি এর সঙ্গে আরও যোগ করেন, ''এদেশে ইসলামি শক্তি মজবুত হবার কারণ হলো ইসলামের প্রতি বেড়ে চলা আস্থা ও ইসলামি আইনের প্রগতিশীল তাৎপর্য। তিনি ইসলামের প্রতি উদ্ধত আচরণের জন্য হিন্দুদের দোষারোপ করেছেন। তাঁর মন্তব্য, ''ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের তাচ্ছিল্যকর মনোভাব একেবারে অযৌক্তিক। এতে ইতিহাসের অপমান হচ্ছে আর এদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষতি করছে। ...মুসলমানদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ইউরোপীয়রা আধুনিক সভ্যতার পথপ্রদর্শক হয়েছে... দুর্ভাগ্যবশত, ভারত ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেবার কারণে যে ইসলামি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে পুরোপুরি লাভবান হতে পারেনি... ইসলামের অবদানের পরিচয় পেলে একগুঁয়ে আত্মতুষ্ট হিন্দুরা প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে পারেন।'' ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার কট্টর বিরোধী বামপন্থীরা এইভাবে ক্রমাগত ভারতের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সামুহিক চেতনাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে চলেছে।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে পরিণত করতে কমিউনিস্টরা মুসলমান আন্দোলনের সাহায্য নিয়েছিল। মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 'জনগণের সংগ্রাম'-এ বদলে দিতে চেয়েছিল। হিন্দু-বিরোধী প্রচারের ফলে, শত্রুর শত্রু মিত্র এই নীতিতে লিগের সঙ্গে বামপন্থীদের একটা সাধারণ যোগসূত্র গড়ে ওঠে। ১৯৪০-এর সময় থেকেই সিপিআই মুসলিম লিগকে গণসংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের সমকক্ষ বলে প্রচার করতে থাকে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ডিগবাজি খেয়ে কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করে ও দ্বিজাতি তত্ত্বকে মানসিক সমর্থন যোগাবার জন্য বহুজাতিক তত্ত্ব খাড়া করে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করার সঙ্কল্প নিয়ে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে সিপিআই কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'ভারতবর্ষ যেহেতু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব বাসভূমি এবং তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভাষা,

সংস্কৃতি, মানসিক গঠন ও অর্থনৈতিক জীবন রয়েছে, সে কারণে তাদের প্রত্যেককে পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য করতে হবে। ভারতীয় ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করার তাদের অধিকার থাকবে এবং তারা যদি মনে করে তবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবারও অধিকার থাকবে।' বৃটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ না করে তাদের সুবিধাবাদী নীতির নিকৃষ্টতম নজির রেখেছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ও তারা বৃটিশের একান্ত অনুগত চর হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারিতে বামপন্থীরা লিখেছিল যে, 'বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন অন্ধগলিতে প্রবেশ করেছে।' তারা গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণদের লাগামছাড়া ভাষায় আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগানকে চিন্তার দেউলেপনা বলতেও ছাড়েনি। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশী স্যার রেজিনাল্ড-এর কাছে আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন যে তিনি ও তাঁর দল ভারতছাড়ো আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে কী চমৎকার কাজ করেছেন। বৃটিশের কাছে সিপিআই-এর গুরুত্ব প্রমাণ করতে যোশী তৎপর হয়ে উঠেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করে আর সুভাষ বোস-সহ কংগ্রেস নেতাদের তীব্র ভর্ৎসনা করে তাঁরা তাঁদের গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের এইসব কাজকর্মে গান্ধীজী হতবাক হয়ে যান। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে পি সি যোশীকে লেখা চিঠিতে গান্ধীজী উল্লেখ করেছিলেন যে কমিউনিস্টরা কীভাবে শ্রমিক নেতাদের বৃটিশের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন।

শুধু হিন্দু ভারত আর মুসলমান ভারতে ভেঙে দেওয়াই নয়, ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে ভারতকে ছোট ছোট

পিপলস্ ওয়্যার পত্রিকায় নেতাজীকে গাধা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

ওই পত্রিকাতেই নেতাজী জাপানিদের ডেকে আনছেন দেখানো হয়েছে।

স্বাধীন ভূখণ্ডে ভাগ করারও বদ-মতলব ছিল তাদের। কংগ্রেসের পেছনে বিপুল জনসমর্থন থাকায় তারা কমিউনিস্টদের আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেকারণে কংগ্রেস তাদের কাছে জাতীয় বুর্জোয়া দল হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মুসলিম লিগকে তারা ভারতীয় মুসলিম বুর্জোয়া বললেও তাদেরই সঙ্গে কৌশলগত সন্ধিতে আগ্রহী হয়। বড় বুর্জোয়া কংগ্রেসকে প্রতিহত করতে ছোট বুর্জোয়া মুসলিম লিগের ভেতরে কমিউনিস্টরা তাদের মুসলমান সদস্যদের ঢোকাতে শুরু করে। পাঞ্জাবে শিখদের আলাদা রাষ্ট্রের দাবিকেও কমিউনিস্টরা সমর্থন করে। সুপরিচিত ভারতীয় কমিউনিস্ট আইনজ্ঞ, ড্যানিয়েল লতিফ পাঞ্জাব মুসলিম লিগের ইস্তাহার তৈরি করে দেন।

হিটলারের আক্রমণ থেকে বাঁচতে সোভিয়েত রাশিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিপিআই বৃটেনের যুদ্ধাভিযানকে সমর্থন করেছিল এবং এ ব্যাপারে বৃটিশের প্রতি মুসলিম লিগের সহযোগিতার মনোভাবকে তারা সাধুবাদ জানায়। তাদের কাছে ভারতের স্বাধীনতার থেকেও সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে অনুগত থাকাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ আর এ কে গোপালন (দুজনেই সিপিআই এর নেতা ছিলেন) মুসলমানদের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে স্লোগান তুলেছিলেন— 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'মফলাস্তান জিন্দাবাদ'। একজন বামপন্থী হয়েও খাজা আহমেদ আব্বাস মন্তব্য করেছিলেন যে, 'মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মতাদর্শগত বনিয়াদ যুগিয়ে সিপিআই ভারতকে হত্যা করেছে।'

ভারত ভাগের চক্রান্ত তো সফল হলো, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্টদের হাতে কোনো রসদ থাকল না। পাকিস্তানের মুসলিম লিগ সরকার কমরেডদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে পাকিস্তানের মাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করে দিল। ড. আশরফ এবং সাজ্জাদ জাহির পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনে গতি ফেরাতে গেলে তাঁদের সরাসরি জেলে ঢোকানো হলো। দশ বছর পর ছাড়া পেয়ে তাঁরা দেশে ফিরে এলেন। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে কমিউনিস্টরা তো শিক্ষা নিলেনই না বরং নতুন করে শয়তানি চাল শুরু করলেন। ভারতভাগের পর যে সমস্ত মুসলমানরা ভারতে রয়ে গেলেন তাঁদের মনে হিন্দু জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে একটা গভীর আতঙ্ক তৈরি করলেন। মুসলিম লিগের সঙ্গে তাঁদের পুরোনো বন্ধুত্বকে আবার চাগিয়ে তুললেন। একদিকে তারা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব ধরে রাখলেন, হিন্দুদের প্রতি

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সঙ্গত বলে লাগাতার প্রচার করে তাদের পক্ষে জনমত তৈরি করা শুরু করলেন। হিন্দুদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর জন্য তারা ভারতে মুসলমান শাসনকালকে মহিমান্বিত করে দেখাতে লাগলেন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বসিয়ে তাঁদের পুরস্কৃত করলেন। দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার অনুসারী অখণ্ড রাষ্ট্রভাবনার ধারণাকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে একটি মিশ্র সংস্কৃতির ধারণা চালু করার জন্য তিনি বামপন্থীদের সাহায্য নিলেন। নেহরুর বদান্যতায় তাঁরা তাঁর 'ধর্মনিরপেক্ষ' ছাতার তলায় আশ্রয় পেয়ে গেলেন। সেই সুযোগে দাগি কমরেডরা কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মুসলমানদের ক্ষেপাতে লাগলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নামে তলে তলে তাঁরা গোঁড়া মুসলমানদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আন্দোলনকে জিইয়ে তুলতে লাগলেন। কমিউনিস্টদের এই জঘন্য চক্রান্তের কারণেও মুসলমানরা কখনো জাতীয় মূলস্রোতে নিজেদের সামিল করতে পারেনি।

দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনকালে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাই কিন্তু স্কুলের পাঠ্য বই লেখার ক্ষেত্রে তাঁদের কর্তৃত্ব ধরে রেখেছিলেন। তাঁরা মুসলমান আক্রমণের বর্বরতার ইতিহাস ও হিন্দুদের উপর মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের কাহিনি বেমালুম চেপে দিলেন। হিন্দুদের ধর্মস্থান আক্রমণ ও অজস্র হিন্দু-মন্দির ধ্বংসের পেছনে প্রবল হিন্দু বিদ্বেষের কারণকে পাল্টে দিয়ে তাঁরা অর্থনৈতিক প্রলোভনকে যুক্তি হিসেবে খাড়া করলেন। সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের প্রবল পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মনোভাবকে তারা এভাবে দেখালেন যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মুসলমানরা ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরাকে কলঙ্কিত করেছে। যে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা তারা অভ্যাস বানিয়ে ফেললেন। ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তী সময়ে ভারতে একটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করার স্বপ্ন মুসলমানদের মনে একই ভাবে রয়ে গেছে। সিপিআই এবং সিপিএম উভয়েই কেরলে তাদের জোট সরকারে মুসলিম লিগকে ভালোরকম রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে তাদের এই মনোভাবকে মদত দিয়ে গেছে। মুসলিম লিগের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তারা মালাবারে একটি মুসলমান অধ্যুষিত জেলা তৈরি করে মাল্লাপুরম্ নাম দিয়েছে।

চীনের ভারত আক্রমণের সময়ে সিপিএম দেশদ্রোহীর ভূমিকাই পালন করেছে। 'চেয়ারম্যান মাও আমাদের চেয়ারম্যান।' এই স্লোগান থেকে শুরু করে কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে তারা চীনকে সাহায্য করে গেছে। কমরেড জ্যোতি বসু চীনের আক্রমণের জন্য ভারতকে দায়ী করেন। তিনি বলেছিলেন যে, 'ম্যাকমোহন নামে এক কাল্পনিক সীমারেখা'কে কেন্দ্র করে ভারতের বিবৃতিতেই চীন ভারত আক্রমণ করতে প্ররোচিত হয়। কালিম্পং শহর চীনা গুপ্তচরের ডেরা হয়ে পড়ে। ভারতীয় সৈনিকদের প্রতিটি পদক্ষেপ কমিউনিস্টরা নজরে রাখতো আর ধারাবাহিকভাবে চীনা গুপ্তচরদের কানে পৌঁছে দিত।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় কংগ্রেসের প্রভাব কমতে থাকার সময় থেকে কমিউনিস্টরা মুসলমানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে শুরু করে। প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে মুসলমানরা বাংলায় বামেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। তার পরিবর্তে কমিউনিস্টরা সরকারি ছত্রছায়ায় অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ- কারবারকে বাড়তে দিয়েছে। ১৯৮৯ সালে ২৮ এপ্রিল বাম সরকারের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভারতের মধ্যযুগের বহু বিষয় 'বিতর্ক' বলে ইতিহাস বই থেকে বাদ দেবার সুপারিশ করে। ইউপিএ সরকারের আমলেও মুসলমানদের খুশি রাখার জন্য ভারতের ইতিহাসকে 'নির্বিষ' করার জন্য সরকারকে চাপ দিয়ে গেছে। মুসলমান ভোটে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কমিউনিস্টরা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অপ্রতিহতভাবে মুসলমানদের এদেশে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের ভোটাধিকার দিয়েছে। এদেশে কমিউনিস্টদের কার্যধারা পর্যালোচনা করে একটিই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মুসলমানদের শুধু সন্তুষ্ট করাই নয়, তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকারবারে অফুরন্ত প্রাণশক্তির যোগান দেওয়াই কমিউনিস্টদের প্রধান কর্মসূচি। ভারতে কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহিতার নিকৃষ্টতম নজির হলো মাওবাদী আন্দোলন। মাও জে দং-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত এই অতিবাম মৌলবাদী শাখাটি আজ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ। জোতদার মহাজনদের হাত থেকে ভূমিহীন কৃষকদের শোষণমুক্ত করার নামে লুণ্ঠনকারী এই বাম শাখাটি আজ একটি উন্মত্ত ঘাতক দলে পরিণত হয়েছে। দেশের নিরাপত্তারক্ষী থেকে সাধারণ মানুষ মিলিয়ে গত কুড়ি বছরে তারা ১২ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে নয়, বিভিন্ন মৌলবাদী মুসলমান সংগঠনের সঙ্গেও এদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চীন, বেলজিয়াম, জার্মানি, নেপাল প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্টরা এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত যোগায়। মুম্বই-য়ের রেজিস্টান্স গোষ্ঠী, অসমের উলফা, শ্রীলঙ্কার এলটিটিই, মণিপুরের পিএলএ প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাহায্য নিয়ে এরা উত্তর পূর্বাঞ্চল-সহ বিভিন্ন অঞ্চলকে ভারতভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জঘন্যতম ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্টরা বিভিন্ন সময়ে সুচতুরভাবে এদেরকে সমর্থন যোগায় ও সমর্থন আদায় করে থাকে। তাই ভারতের যে সমস্ত রাজ্যে বামপন্থীদের প্রভাব রয়েছে সেখানকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উগ্রবাম ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে ভারতবিরোধী স্লোগান তোলাটা তাদের বৃহত্তম ষড়যন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বাংলায় বামেদের দেউটি নিভেছে। তাই কেরল ও ত্রিপুরায় দীপ নেভার আগেই তাঁরা জ্বলে উঠতে চান। আর সে কাজ করতে তাঁরা তাঁদের দেশদ্রোহিতাতেই ভরসা রাখতে চান। কেননা তাঁরা ভালোমতো জানেন যে দেশদ্রোহী ছাড়া দেশপ্রেমিকের সমর্থন পাওয়াটা আজ তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

কৃষকের ভগবান

জয়রামভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আমরা স্বচক্ষে ঈশ্বরকে না দেখলেও মানুষের মধ্যেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। আজকের দিনে মানুষ যেখানে একে অপরের দুঃখ-কষ্টে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় সেখানে কেউ যদি ব্যতিক্রমী চরিত্র হন তাহলে তাঁকে ঈশ্বর ছাড়া আর কী ভাবা যেতে পারে? জয়রামভাই থেসিয়া এরকমই এক ব্যক্তি। তিনি কৃষকদের কথা চিন্তা করে নিজ উদ্যোগে ৮ কিলোমিটার একটি নদী সংস্কার করে চলেছেন।

গুজরাটের সৌরাষ্ট্রের আমরেলি জেলায় থেবী নদী। এই নদীকে ঘিরে রয়েছে কয়েক হাজার একর কৃষিজমি। চাষাবাদের ক্ষেত্রে এই নদীর জল খুবই কাজে লাগতো। কিন্তু পরবর্তীকালে পলি পড়ে নাব্যতা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে। নদী প্রায় শুকিয়েই যায়। কৃষকদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জয়রামভাই থেসিয়া (৬৫)। সুরাটের এই হিরে ব্যবসায়ীর নিজ উদ্যোগকে কৃষক থেকে প্রশাসনিক আধিকারিক সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জয়রামভাই জানান, 'আমি একজন চাষির ছেলে। আমি দেখেছি আমার গ্রামের চাষিরা কত কষ্ট করছে এক ফোঁটা জলের জন্যে। তাই শৈশব অবস্থাতেই মনস্থির করেছিলাম জীবনে কোনোদিন যদি ধনী হতে পারি তাহলে আমি আমার গ্রামের জন্য কিছু করবো।' করে দেখিয়েছেন এই কোটিপতি ব্যবসায়ী। থেবী নদীকে সেচের কাজে উপযুক্ত করে তোলার জন্য তিনি নিজেই একটি লক্ষাধিক টাকা দামের জেসিবি ওডাস্কার মেসিন কিনেছেন। গত তিন মাস ধরে নিজস্ব জেসিবি এবং ডাম্পার মেসিনের সাহায্যে নদী খননকার্য চলছে। ৮ কিলোমিটার এই নদীটির চার ভাগের এক ভাগ কাজ সবে হয়েছে। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে কাজ চলছে। এই নদী খননের কাজে যোগ দিয়েছে প্রায় শতাধিক শ্রমিক। গুজরাট সরকারের কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই এই নদী খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে যে কোনোরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু হীরে ব্যবসায়ী জয়রামভাই তা নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আজ আমার সবকিছু রয়েছে, সমাজের ভালোর জন্যে তা দিতে আমি প্রস্তুত। সমাজের জন্য আমৃত্যু কাজ করে যেতে চাই।' এই সামাজিক কাজে তাঁকে তাঁর স্ত্রীও সাহায্য করে চলেছেন। প্রতিদিন যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাদের জন্য নিজে খাবারের বন্দোবস্ত করেন। জয়রামভাইয়ের কথায়, 'আমার নদী সংস্কারের কাজে সর্বদা সাহস জুগিয়ে এসেছেন আমার স্ত্রী। তিনি খুবই উৎসাহিত। গত তিনমাস ধরে সুরাটের বাড়ি ছেড়ে আমরেলির বাবরা গ্রামেই তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন।' মূলত এই নদী সংস্কার হলে কৃষক যেমন উপকৃত হবে তেমনি আমরেলির বাবরা গ্রামও লাভবান হবে। পানীয় জলের সমস্যাও মিটবে বলে জানা যায়। এই নদীর ওপর চেকড্যাম গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি। সেখানে বর্ষার জল ধরে রাখলে চাষের ক্ষেত্রে উপযোগী হবে। তবে জয়রামভাই মনে করেন, নদী সংস্কারের যে কাজ চলছে তাতে পরবর্তী '৫০০ বছর' কৃষকদের সেচের জলের কোনো সমস্যা হবে না। সারা বছরই চাষাবাদ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাটি 'নন্দন বন'-এ পরিণত হবে।

জয়রামভাই থেসিয়া গুজরাটের আমরেলি জেলার বাবরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক। সুতরাং মাঠে ঘাটেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বোঝেন এক ফোঁটা জলের জন্য কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় একজন কৃষককে। তাই তখনই তিনি মনস্থির করেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজের কাজ করবেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। অভাবের তাড়নায় উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব না হলেও প্রকৃত মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তিনি। শৈশব বয়সেই তিনি হিরে-সোনার কাজে লেগে পড়েন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই হিরে ব্যবসায় কোটিপতি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ে নদী সংস্কার এবং চেকড্যাম তৈরি করেছেন। তাই আজ তিনি কৃষকের ভগবান। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

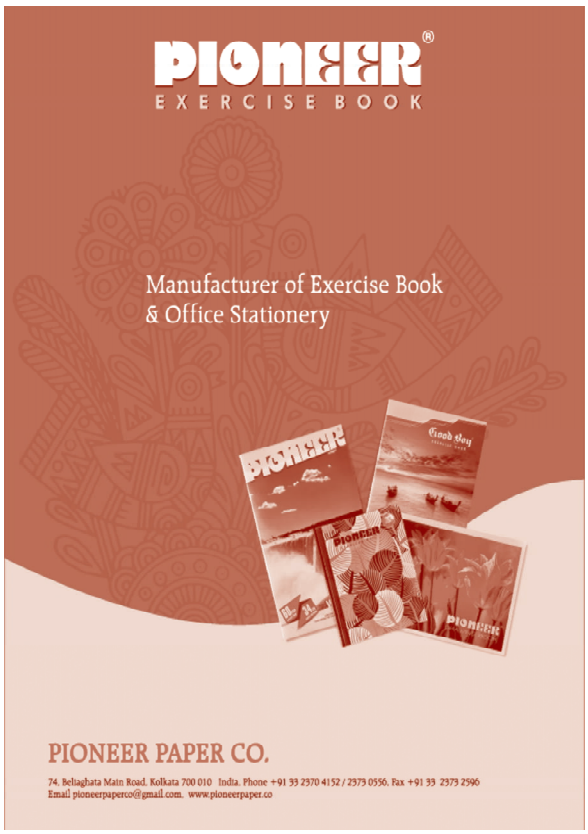

‘কাজ করা, দুঃখবরণ করা, উচ্চতম স্তরে ভালবাসা, সবরকম গণ্ডি অতিক্রম করে, মহত্তম কারণের জন্য অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া, জাতির নায্য অধিকার রক্ষায় দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ানো— এখানেই ভারতীয় নারীর সত্যকারের মুক্তি, আর এদেশের মেয়েদের যথার্থ শিক্ষার এই হল চাবিকাঠি।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

জয়চাঁদ-উর্মিচাঁদ-মীরজাফরের ভূমিকায় রাহুল গান্ধী

দেবী প্রসাদ রায়

জওহরলাল নেহরু প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে। বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তায় তা ব্যর্থ হয় প্রাথমিক ভাবে। কাশ্মীর যখন পাকিস্তানি হানাদারদের কবলমুক্ত হওয়ার পথে ঠিক সেই সময় আগবাড়িয়ে কাশ্মীর প্রশ্নকে মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রসঙ্ঘে তুলে কাশ্মীরের এক বৃহদংশকে পাকিস্তানকে পাইয়ে দিয়ে হানাদার লাঞ্ছিত কাশ্মীরবাসী তথা ভারতবাসীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন নেহরু। এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে ভারতবাসীর কোটি কোটি টাকা পাম্প করে নিয়ে এসে কাশ্মীরের মাটিকে পাকিস্তানি চক্রান্তের উর্বরভূমি করে তোলা যায়। তাঁর অবিমৃশ্যকারিতায় ভারতের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের জমির দখল নিতে থাকে চীন। বৃটিশ ভারত স্বাধীন হলে উত্তর সীমান্তের ইয়াটুং অঞ্চল ওই সূত্রে স্বাধীন হলো। নেহরু তাঁর সম্পত্তিজ্ঞানে ওই অঞ্চলকে তার টেলিগ্রাফিক ব্যবস্থা-সহ চীনকে অযাচিতভাবে ভেট দিয়ে দিলেন। কাশ্মীরে তাঁর দূরদর্শিতার বহর দেখেই একটু একটু করে এগিয়ে অবশেষে ১৯৬২-তে ভারত আক্রমণ করে চীন। কলোম্বো প্রস্তাবানুসারে চীন সরে গেলেও লাদাক এবং অরুণাচলের উপর চৈনিক আক্রমণের হুমকি থেকে যায়, আজও আছে। তারপর কংগ্রেসকে নিয়ে এমন ব্যবস্থা ও মানসিকতার প্রবর্তন করেন যাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁর পরিবারের বাইরে না যায় বা গেলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থানুকূল ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আমরা যদি মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখবো সেই ব্যবস্থামতোই চলছে কংগ্রেসী কার্যকলাপ— নিজেদের কর্তৃত্বাধীন না থাকলে ভারত খণ্ডিত হোক আরো, শত্রুকবলিত হোক, জাহান্নামে যাক তাতেও আপত্তি নেই। উপযুক্ত বামপন্থী দোসর-সহ কংগ্রেসের ভূমিকা তাই-ই প্রত্যয়িত করছে না? নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ রটনার পরিপুষ্টি ও তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের সবটুকু সম্ভাবনা সযত্নে বিনাশ করতে নেহরু তথা কংগ্রেসী নেতাদের প্রয়াস দেশবাসীর সামনে আজ স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে গেছে।

নেহরুর মৃত্যুর পর যথোপযুক্ত আদর্শনিষ্ঠ সৎ মানুষ লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী করতে হয়। কিন্তু তিনি তো আর নেহরু পরিবারের কেউ ছিলেন না! তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো অস্বাভাবিক ভাবে তাসখন্দে। তাঁর অপরাধ ছিল ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দিল্লী দখল করার যুদ্ধে পাকিস্তানের স্বপ্নকে চুরমার করে লাহোর দখল করার। একটা সার্বভৌম দেশ ভারত তার প্রধানমন্ত্রীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করল না, তদন্ত চাইল না। নেতাজীর মৃত্যুর মতোই, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর মতোই এই মৃত্যু। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুও রহস্য থেকে গেছে। এর পরেই প্রধানমন্ত্রী হলেন, না কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামী, না কোনো অভিজ্ঞ কংগ্রেস নেতা; হলেন নেহরু কন্যা অপেক্ষমানা ইন্দিরা। ইন্দিরা গান্ধী ফিরোজ গান্ধীর স্ত্রী— এই গান্ধী গান্ধী নয়। তবুও গান্ধীর ব্র্যান্ড নেমের দেশীয় আন্তর্দেশীয় কাট্‌তির জন্য এই পদবিকে অ্যাডপ্ট করা হলো। ইন্দিরা গান্ধী এক অসাধারণ রাষ্ট্রনায়িকা--- এই বিশ্লেষণ তাঁকে হেয় করতে নয়— তবুও ইতিহাসটাতো জানা দরকার পারিবারিক ক্ষমতা দখলের ধারবাহিকতাকে বুঝতে।

> **বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 'লুণ্ঠনকেন্দ্র' গুলিতে হাত দেওয়াতেই ভারসাম্য হারানো ক্ষিপ্ত বামপন্থীরা শোরগোল তুলছে এবং ভারতবাসীর দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে ও ভারতের সংবিধান, ভারতের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে নেমেছে।**

দূরদর্শী ইন্দিরা গান্ধী বুঝেছিলেন তাঁরই একছত্র আধিপত্য অভিলাষে দাস থেকে ক্রমশ দাসানুদাসে পরিণত হতে যাওয়া কংগ্রেস ভবিষ্যতে এককভাবে তাঁর বংশানুক্রমিক শাসনকে শক্তি ও সমর্থন যোগাতে পারবে না। দোসর দরকার। এজন্য কমিউনিস্টরাই হতে পারে উপযুক্ত দোসর। ক্ষমতার ছিটেফোঁটা দিয়ে ক্রয়যোগ্য কমরেডরাই হয়ে উঠবে কার্যকর সহযোগী। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস গবেষণা এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। নুরুল হাসানের আনুকূল্যে কমিউনিস্ট রাশিয়া ও চীন থেকে আমদানি করা প্রগতিশীলতার জোয়ারে ভাসা দেশের শিক্ষাজগৎ

অতি দ্রুততায় দখলীকৃত হলো কমিউনিস্টদের দ্বারা। রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের মোহে অস্বাভাবিক তৎপরতায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং অবশেষে রাজ্য ক্ষমতা দখল হলো পশ্চিমবঙ্গে। কেরলে, ত্রিপুরায়, যত্রতত্র যথেচ্ছভাবে কৃত্রিম উপায়ে মার্কসবাদের প্রয়োগ দ্বারা ভারতে মূলজীবনচর্যার ধারা থেকে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে, ভারতীয় দর্শন থেকে মানুষকে বিচ্যুত করা হলো। এবং এই কাজে নিযুক্ত হলেন রোমিলা থাপ্পার, ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র, বিপানচন্দ্র, সুমিত সরকার, আর এস শর্মা প্রমুখ। অতি দক্ষতায় এই কাজ হচ্ছিল সরকারি অর্থানুকূল্য ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিপুল অর্থলুণ্ঠনের মাধ্যমে। মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারল। ঘটে যাওয়া অনেক ক্ষতির মাঝখানে প্রতিবাদ প্রতিরোধ শুরু হলো পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সঙ্গে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, ICHR [Indian Council of Historical Research]-এর। Asian Age 1998, 9th Augest-লিখেছিল, ''The ICHR has over the years transformed into a vortex into within an increasing number of research work and a spiralling sum of funds regularly vanishes.'' এই ICHR-এর সহায়তায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকৃত ইতিহাসকে নিয়ে Time Capsul গান্ধীজীর সমাধির নীচে পোঁতা হয়েছিল মনে আছে? প্রথম এনডিএ আমলে এই লুণ্ঠন বন্ধের প্রয়াস হতেই গেরুয়াকরণ, গেরুয়াকরণ বলে চীৎকার চেঁচামেচি তুলেছিল বামপন্থীরা অবশ্যই কমিউনিস্ট নেতৃত্বে। সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ তুলে রিট পিটিশন করে বামপন্থীরা, পিটিশন খারিজ হয় [Supreme Court of India Judgment 12 Sept. 2002]।

কমিউনিস্টদের খুশি করতে ৪২তম সংবিধান সংশোধনে সংবিধানের উদ্দেশিকায় (Preamble) ঢোকানো হয়েছিল সেকুলার এবং সোশ্যালিস্ট দুটি অতি বিভ্রান্তিকর শব্দ। সেকুলার শব্দটি মোটেই ধর্মনিরপেক্ষতা জ্ঞাপক নয়, যদিও আমাদের দেশে চতুর ভণ্ডামিতে তাই চলছে। সেকুলার শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'সেকুলাম' থেকে যার অর্থ হলো চার্চ বিরোধী, যাজক বিরোধী non ceclasiastical, profare, non Sacred. ইউরোপীয় রেনেশাঁ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এটি ঈশ্বর বিরোধিতারই প্রতিভূ হয়ে ওঠে। আমাদের সংবিধানে যে শব্দটি ঢোকানো হলো তাতে এক মুহূর্তে দেশবাসী নাস্তিক হয়ে গেল? সে সংজ্ঞাটা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সঞ্চিত রেখে 'ধর্মনিরপেক্ষ' অর্থজ্ঞানে এবং প্রয়োজনে যেমন খুশি ভাষ্য ব্যবহারে 'সেকুলার' ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষা নীতির রূপায়ণে এনডিএ কোনোভাবেই প্রচলিত অর্থের সেকুলারকে ক্ষুণ্ণ করছে না— এই ছিল সুপ্রিম কোর্টের রায়।

বর্তমানে এনডিএ সরকার 'লুণ্ঠনকেন্দ্র' গুলিতে হাত দেওয়াতেই ভারসাম্য হারানো ক্ষিপ্ত বামপন্থীরা শোরগোল তুলছে এবং ভারতবাসীর দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে ও ভারতের সংবিধান, ভারতের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করা সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে নেমেছে। কংগ্রেসও দেশ শাসনে 'হয় আমরা' মানে গান্ধী পরিবার না হলে দেশের 'আর কেউ নয়'— এই Dog in the Manger Policy নিয়েছে। বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে যোগ দিয়েছে আপাত সুবিধে সুযোগ পাওয়ার কৌশলের জন্য, গণতন্ত্র প্রীতির জন্য নয়। কারণ তাদের মাথায় আছে লিউ শাও চি ''আমরা গণতন্ত্রে অংশ নিই ভেতর থেকে তাকে ধ্বংস করব বলে।'' এরা, বামপন্থীরা 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, পাকিস্তানের জন্মলগ্নে তাকে সমর্থন করেছে, চীন আক্রমণের সময় চীনের পক্ষ নিয়েছে, সমস্ত দেশদ্রোহীদের সমর্থন করেছে।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আফজল গুরুর' সমর্থকদের সমর্থন তো এখনের বাপারে, এর অনেক আগেই আফজলগুরুর ফাঁসির সময়েই তার পক্ষ নিয়েছিল। ভারতের বিপদের দিনের জন্য এরা 'পঞ্চমবাহিনী' তৈরি করে রাখছে। শুধু ওই বিপথগামী, বামপন্থী প্ররোচিত ছাত্রদেরকেই নয়, তাদের যারা সমর্থন করতে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাদের বিরুদ্ধেও 'দেশদ্রোহিতা'র জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই নেতারাই মূল অপরাধী এবং ছাত্রদেরকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছে।

যে আইএসআই আমাদের দেশের সর্বনাশে সদা তৎপর দীর্ঘকাল ধরে, পাকিস্তানে তাদের অফিসে কেন গেছেন মণিশঙ্কর আয়ার এবং সলমন খুর্শীদ— তার তদন্ত হওয়া দরকার। ইজরায়েলের মতো সদা সতর্ক না থাকলে— সদা প্রস্তুত না থাকলে বাইরের এবং ভিতরের ভারতবিরোধীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে না। জয়চাঁদ উর্মিচাঁদ মীরজাফরদের আমরা প্রশ্রয় দিব কি? রাহুল গান্ধী আচরণে কি এদের উত্তরসূরী নয়?

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

অসহিষ্ণুতার নামে অস্থিরতার সৃষ্টির প্রচেষ্টা

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

বাম-উদারবাদী রাজনৈতিক নেতারা কানহাইয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচা করে তাঁকে মুক্ত করেছে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার জন্য। সমালোচকরা বলছেন, যে পরিমাণ অর্থ খরচা হয়েছে তা এক সঙ্গে কয়েকশত দরিদ্র পরিবারকে আর্থিকভাবে সুবিধা দিতে পারত। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়েছিল তাঁরাই পরিস্থিতির চাপে কথা পাল্টে বলছে সরকার বিরোধী স্লোগান ছিল সেগুলো। এবিভিপি নেতাদের দায়িত্ব নিয়ে মানুষের কাছে জে এন ইউ এবং এইচ সি ইউ-তে যে ঘটনা ঘটেছিল তা পরিষ্কার করে বলতে হবে।

কমিউনিস্টদের দারিদ্র্যকে সামনে রেখে রাজনীতির খেলায় তাকে ব্যবহার করার কৌশল বহুদিনের। কানহাইয়ার দারিদ্র্যের জন্য দায়ী কে? দু' বছরের মোদী সরকার নাকি ৬০ বছরের বাম-উদারবাদী কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সরকার। সরকারে কংগ্রেস ও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কুলীন পদে কমিউনিস্ট— এই তো ছিল ব্যবস্থা। এর ফসল ফলছে। কিছু ছাত্রকে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের মতো আচরণ করার পাঠ দিচ্ছে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কিছু মাস্টারমশাই। ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যে দরিদ্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার মতন অবতার জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সিপিএম দারিদ্র্যের নামে রাজনীতি করে আজ ভারতের সবচেয়ে ধনী দলগুলির একটি। তাঁরা কত দরিদ্রের বন্ধু তা মানুষ পশ্চিমবঙ্গে দেখছে ৩৪ বছর।

> **দীর্ঘদিন ধরে কুলীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের করদাতাদের পয়সায় প্রতিপালিত হয়ে দেশ বিরোধী কার্যকে তলে তলে সব রকম সাহায্য করার প্রক্রিয়াকে এক শ্রেণীর ছাত্র শিক্ষক প্রশ্রয় দিয়েছে এবং ভোটের স্বার্থে মেনে নিয়েছে। বাক্‌স্বাধীনতা বলে একে চালাতে চাইছে স্বার্থপর আত্ম-বিক্রয় করা রাজনৈতিক শক্তি।**

তাঁদের বুদ্ধিজীবীকুলকে দেখেছে কীভাবে সরকার বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে দল বদল করে সরকারি সাহায্যের প্রসাদে সুখে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন রাতারাতি। বাজারি পত্রিকা কীভাবে কংগ্রেস সেবা করতে করতে আজ কংগ্রেস সিপিএমের হাত ধরার ফলে কানহাইয়াকে সামনে এনে কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে বাম-উদারবাদীদের পক্ষে হাওয়া তোলার চেষ্টায় রত।

এতই যদি নিশ্চিন্ত যে কানহাইয়াকে দেশের মানুষ মাথায় তুলে নাচবে তাহলে ছাত্রনেতাকে যে কেন্দ্রে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি সেখান থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক আর দেশভক্ত শিবির সেই কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সেনার বিধবা পত্নীকে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করবে। তারপর মানুষ তাঁর রায় দেবে। আজকাল সহিষ্ণুতার পাঠ শেখানো যাদের স্বভাব তাঁরা কী করছে? টিভিতে ডেকে বিজেপি প্রতিনিধি যাতে বলতে না পারে সেই ব্যবস্থা করছে। দীর্ঘ ৬০ বছর তাঁদের রাজত্বকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদী লেখা কোনো কাগজে যাতে প্রকাশিত না হয় সেই প্রচেষ্টা করেছে।

আজ 'মা দুর্গাকে' অশ্লীল ভাষায় বলাকে বাক্‌স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করা, বিবেকানন্দকে অপমান করাকে বাক্‌স্বাধীনতার সঙ্গে মেলানো। জে এন ইউ-তে এবং এইচ সি ইউতে কীভাবে 'মা দুর্গা' ও স্বামী বিবেকানন্দকে নোংরা ভাষায় বলা ও লেখা হয়েছে মানুষ তা দেখেছে। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের সঙ্গে দেশ পূজার ইতিহাস যুক্ত। বন্দেমাতরমের মধ্যে দুর্গার বন্দনা এক হয়ে আছে। মা দুর্গাকে অপমান ও ভারতমাতাকে অপমান সমার্থক। মহিষাসুরকে পূজার সময় গলায় পৈতে দেওয়া হয়। রাবণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাম, কৃষ্ণ, শিব অব্রাহ্মণ। আর এস এস-বিজেপি উচ্চবর্ণের প্রচার করে বলে যে মিথ্যাচার কংগ্রেস-সিপিএম করে আসছে তাও প্রকাশিত হয়ে পড়ছে।

কিছু প্রচারমাধ্যম এক চতুর প্রক্রিয়ায় চলে। ভারত বিরোধী শক্তি মোদীজীকে হত্যা করার জন্য ইশরাত জাহানকে পাঠিয়েছিল, অথচ তাকেই নিরীহ বলে প্রচার করতে শুরু করে। কলমচি বসেছে বুদ্ধিজীবী হয়ে অন্যের

বুদ্ধিনাশের উদ্দেশ্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বুদ্ধিজীবী, কলমচিরা হলেন বিত্তজীবী। প্রথমে ভারতের শতাব্দী প্রাচীন ধর্ম-সংস্কৃতিকে সমালোচনা কর। তাহলে হিন্দু সন্দিহান হয়ে কিনবে। কৌতূহলের বশে দেখবে। এ সবের ফলে বাজারে বিক্রি হবে বেশি। এই বাজারি সাফল্য দেখিয়ে বিদেশের ভারত বিরোধী শক্তির কাছ থেকে ইউরো-ডলার ও পেট্রোডলার পাওয়া হবে সহজ, বিদেশি পুরস্কার হবে সহজলভ্য। এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত বিরোধী শক্তি অসহিষ্ণুতা-সহিষ্ণুতার বির্তকের আড়ালে দেশের সর্বনাশে লিপ্ত থাকবে যাতে ভারত দুর্বল হয়ে পড়ে।

দীর্ঘদিন ধরে কুলীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের করদাতাদের পয়সায় প্রতিপালিত হয়ে দেশ বিরোধী কার্যকে তলে তলে সব রকম সাহায্য করার প্রক্রিয়াকে এক শ্রেণীর ছাত্র শিক্ষক প্রশ্রয় দিয়েছে এবং ভোটের স্বার্থে মেনে নিয়েছে। বাক্‌স্বাধীনতা বলে একে চালাতে চাইছে এই স্বার্থপর আত্ম-বিক্রয় করা রাজনৈতিক শক্তি। দেশের আমলাতন্ত্রে, কাগজের সম্পাদকীয় লেখক-কুলের মধ্যে যদি এই ধরনের শক্তি ঢুকে পড়ে, ভারতে চিন্তা ও মেধার জগতে এই ধরনের শক্তির প্রবেশ ঘটে, তবে দেশের সুরক্ষার প্রতি বিপজ্জনক। মোদী সরকার এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে তাই অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

আজ যাঁরা গৈরিককরণের কথা বলছে তাঁরা শিক্ষার 'সবুজায়ন' ও 'অনিলায়নের' সময় কোথায় ছিলেন? ভারতের চিরকালীন রং গেরুয়া তাকে গৈরিককরণের প্রয়োজন নেই। দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ঘরানার শিক্ষকদের স্থানে দলে দলে দলীয় ক্যাডারকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আজ যাঁরা ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নামে কালিমা লেপন করছে তাদের নামগুলো দেখুন বুঝতে পারবেন এখানের যোগসূত্রটা কোথায়, তা হলেই সত্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্বচ্ছ সরকার, দুর্নীতি ছাড়া দু-বছরের সরকারকে হেনেস্থা করতে তাঁদের সমস্ত সদর্থক কাজগুলোকে চেপে রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে নঞর্থক প্রচার করা হচ্ছে। ২০১৫-তে দেশে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। সার উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য অর্থ বরাদ্দ সর্বাধিক। বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলছে ২০১৫-তে ব্যবসার মানদণ্ডে ভারত এগিয়েছে। এল আই সি-কে সঙ্গে নিয়ে সামাজিক সুরক্ষায় একাধিক প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। গরিব মানুষ চিটফান্ডের হাত থেকে রক্ষা পায় যাতে জন-ধন যোজনা করা হয়েছে। দেশে কালো টাকা উদ্ধার ও বিদেশে কালো টাকা পাঠানোয় প্রতিবন্ধকতা বাড়ানোর ফলে ভারত উপকৃত হয়েছে। তাই দেশে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরির জন্য কখনও জাঠ কখনও প্যাটেল কখনও মুসলমান কখনও দলিত ইস্যুকে উস্কে দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে সরকারকে অস্থির করার চেষ্টা হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাস আমাদের সঙ্গে মেলে না। আমাদের ভৌগোলিক ও সামরিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গেও এর বিস্তর ফারাক রয়েছে। চীন ও পাকিস্তান যৌথভাবে চাইছে ভারত টুকরো টুকরো হোক তাতে উভয়েরই সুবিধা। কংগ্রেস সুবিধাবাদী রাজনীতি করে কখনও চীনের হাতে জল খাওয়া শক্তির সঙ্গে সন্ধি করে বিজেপিকে জব্দ করতে চাইছে, কখনও পাকিস্তানের স্নেহধন্যদেরও উক্ত মানসিকতার মানুষজনকে এগিয়ে দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিকে শক্ত করছে। মিডিয়ার একটি অংশ অর্থলোভে এই অনৈতিক চক্রব্যূহ রচনায় সাহায্যের ভূমিকায় নেমেছে। পশ্চিম বিশ্ব ভারতকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে নরমে-গরমে এই প্রক্রিয়াকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে।

যাঁরা আন্তর্জাতিকতাবাদ নিয়ে উচ্চস্বরে গুণগান করেন, তাঁরা বাংলাদেশে ৫০০ কিলোমিটার দূরে পঞ্চগড়ে হিন্দুর গলা কেটে নেওয়া হত্যাকে দেখেও দেখে না। সমুদ্রগড়, ক্যানিং, নদিয়ার কালীগঞ্জ, মালদা, দেগঙ্গায় একের পর এক ঘটনায় হিন্দু অত্যাচারিত হলে বুঝতেও চায় না। যাদের গুরুরা চীনে ছাত্র আন্দোলন নৃশংসভাবে দমিয়ে দেয় তাঁরাই ভারতে ছাত্রদের ত্রাতা হয়ে অবতীর্ণ হন। অসহিষ্ণুতার আসল সত্য লুকিয়ে আছে মোদী সরকার এন জি ও নামে চলা ব্যবসার হিসাব চেয়েছে। এই এন জি ও-দের দেখেছেন কোনো কথা বলতে যখন কাশ্মীরে হিন্দুরা সর্বস্বান্ত হয়েছে? বাংলাদেশ, পাকিস্তানে অত্যাচারিত হয়েছে। উদ্বাস্তু কল্যাণে এঁদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন, তাহলেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

বাম ও উদারবাদী স্নেহধন্য টিভি চ্যানেলগুলিতে কংগ্রেস ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সাংবাদিকরাই রয়েছে। বিজেপি প্রতিনিধিরা গেলে তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগই দেওয়া হয় না। তাঁরা যখন বলতে শুরু করে তখন কথার মাঝখানে কথা বলে তাঁদের কথা যাতে কেউ স্পষ্টভাবে শুনতে না পায় সে ব্যবস্থা করা হয় সুচতুরভাবে। যাঁরা নিজেরা জোট করে প্রকাশ্যে লড়ছে তাঁরা অকারণ গল্প রচনা করছে অলিখিত জোটের। সি আর পি এফ পাঠিয়ে প্রায় সাত দফায় ভোট করে শান্তিপূর্ণ ভোটের চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন আর সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সব রকমভাবে শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য সাহায্য করতে সচেষ্ট। কিন্তু এই সময় আলোচনায় টিভিতে বিজেপি প্রতিনিধিকে ডাকা হচ্ছে না যাতে অসত্যভাবে রচনা করা অলিখিত জোট তত্ত্বটি যুক্তি তর্কের মাঝে খণ্ডিত হয়ে যায়। এটি একটি সারবত্তাহীন এক রম্যরচনা।

এই প্রচেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরে যাতে ভারতে যুবক ও নব-প্রজন্ম নাস্তিক চিন্তাভাবনাকে প্রগতিশীল ধরে নিয়ে তাকেই মেনে এগিয়ে চলে। এইভাবে তাঁরা কালে কালে ভারতের চিরকালীন যে সনাতন সত্য ও সংস্কৃতির চিরন্তন ধারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাজনীতিবিদদের ও আমলাকুলের এক অংশের লোভের ফলে রাষ্ট্র আজ দুর্গতিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকে আটকাতে ভারতবর্ষ দীর্ঘসময় ধরে এক ধর্ম-সংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করেছে। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরস্কার ফিরিয়েছে অনেকেই তার মধ্যে অর্থ মূল্য কাছে রেখে বিহার ভোটের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিকে শক্তি যোগাতে এই ঘৃণ্য রাজনীতি করেছেন, তাঁরা আগামীদিনে আমাদের নতুন প্রজন্মের নিকট প্রকৃত বুদ্ধিজীবী নন। এদেশের চিরকালীন যে ধারা তাকে রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ দেখিয়েছেন সে পথই আমাদের পাথেয়।

সফল হকি ইন্ডিয়া লিগ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য শেষ হওয়া হকি ইন্ডিয়া লিগ থেকে এক ঝাঁক প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত যে চার বছর এই পেশাদার হকি ইন্ডিয়া লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে এবারই প্রতিটি দলের খেলার মান ছিল আগাগোড়া উঁচু তারে বাঁধা। বিশ্বের সবকটি উন্নত হকি খেলিয়ে দেশের সেরা খেলোয়াড়রা বিভিন্ন দলের হয়ে খেলায় ভারতের জাতীয় সিনিয়র ও যুব দলের খেলোয়াড়রা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন যা নিঃসন্দেহে রিও অলিম্পিকের আগে এক বড় প্রাপ্তিও বটে। প্রাক্তন আন্তর্জাতিক তারকা ফরোয়ার্ড ও ভাষ্যকার তথা কলমলিখিয়ে জগবীর সিংহ এবারের লিগ থেকে এমনই কয়েকজন নবোদিত নক্ষত্রকে বেছে নিয়েছেন যারা ভবিষ্যতে বিশ্ব হকি সার্কিটে ভারতের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এদের মধ্যে দু-তিনজনকে রিও অলিম্পিকের টিমেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে তারা সর্বোচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। তার মতে হরমনপ্রীত সিং, আরমান কুরেশি, ললিত উপাধ্যায়ের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত সুলতান জোহর কাপ আর গত বছর জুনিয়র এশিয়া কাপে যেরকম দাপট দেখিয়ে খেলে চাম্পিয়ন হয় ভারত, তার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল এই তিনজনের। জোহর কাপে অস্ট্রেলিয়া ও গ্রেটবৃটেনের মতো দুনিয়ার সেরা দুটি দলকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল ভারতের যুব দলটি। আর এশিয়া কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে নিয়ে ছেলেখেলা করেন ভারতীয়রা, যা দেখে জগবীরের মতন অনেক প্রাক্তনই আশাবাদী যে এই দলটিই পারবে ভারতকে তার হৃতগৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে। এই তিনজন ছাড়া আরো কয়েকজন

ললিত উপাধ্যায়

পারবিন্দর সিং

অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন খেলোয়াড় উঠে এসেছে এবারের হকি ইন্ডিয়া লিগ থেকে। যেমন ইমরান খান, পারবিন্দার সিং, বরুণ কুমার, সুরেন্দার কুমার। জগবীর ইমরানের মধ্যে কিংবদন্তী জাফর ইকবালের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন। রাঁচি রেইসের হয়ে খেলেন ইমরান। দলে একগাদা বিদেশি নামি-দামি তারকা। রয়েছেন বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় খেলোয়াড়। তাদের মধ্যে আলাদা করে নজর টেনেছেন ইমরান। ভারতের যুব দলের হয়ে এশিয়া কাপে খেলেছেন কিন্তু এবারের হকি লিগে তার খেলা এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে চলে এসেছে।

কলিঙ্গ ল্যান্সারসের ললিত উপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। কখনো ভাবেননি হকি খেলোয়াড় হবেন, পেশাদার হকি লিগে খেলে নাম, যশ, অর্থ সবই পেয়ে যাবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর নিয়তি নির্দিষ্ট করে তার অন্য গতি। অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক ছেড়ে অ্যাস্ট্রোটার্ফে প্রবেশ করেই যেন জীবনের ছন্দ ও মাত্রা বদলে গেল ললিতের। রিও অলিম্পিকের দলে ঢোকার জোরালো দাবি পেশ করে রেখেছেন ললিত, এবারের হকি ইন্ডিয়া লিগে তার ধারবাহিক ভাল পারফরমেন্সের জেরে। প্রচণ্ড গতির সঙ্গে নিখুঁত বল কন্ট্রোল ললিতকে ভিড়ের মধ্যেও আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। দুরূহ কোণ থেকে গোলের মধ্যে বল পুশ বা রিভার্স ফ্লিক করতেও দক্ষ। ভারতের জাতীয় কোচ রোনাল্ট অল্টমানের নোটবুকে ইতিমধ্যেই উঠে গেছে তাঁর নাম। দিল্লী ওয়েভরাইডার্সের পারবিন্দার সিং যুবভারতীয় দলের অন্যতম আবিষ্কার। দিল্লী অধিনায়ক সিমন চাইল্ড (অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়ার্ড) ও পারবিন্দারের যুগলবন্দী এবারের লিগে অনেক ম্যাচে দলকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে উতরে দিয়েছে। খেলা তৈরি করা থেকে 'ডি'এর মধ্যে ঢুকে গোল তুলে আনা সব ব্যাপারেই মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন পারবিন্দার। অনেকটা জগৎবিখ্যাত পূর্বসূরী রামনদীপ সিংহের কার্বনকপি।

চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব ওয়ারিয়র্সের বরুণ কুমার তার অধিনায়ক সর্দার সিংহের অত্যন্ত আস্থাভাজন এক খেলোয়াড়। ভারতীয় অধিনায়ক সর্দার এই মুহূর্তে বিশ্ব হকির এক জনপ্রিয় চরিত্র। তার মতন মহা তারকার প্রশস্তি বরুণকে বাড়তি উদ্দীপনা জোগায় এবং ভবিষ্যতে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পথও প্রশস্ত করে দেবে বলে তার ধারণা। ডিপ ডিফেন্সে খেলে প্রতিটি ম্যাচে নির্ভরতা দিয়ে গেছেন দলকে। তবে সর্টকর্নার থেকে গোল তুলে আনার ক্ষেত্রে আরো ধৈর্যশীল হতে হবে। দলের দুই বিশ্বখ্যাত বিদেশি মার্ক নোয়েলস ও সাইমন অরচার্ড তাকে ম্যাচের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়েছেন, যা থেকে ভবিষ্যতে অনেক পরিমার্জিত বরুণকে পাওয়া যাবে বলে সর্দারের ধারণা। দিল্লী দলটির ডিফেন্ডার সুরেন্দার কুমার ভবিষ্যতের সিনিয়র জাতীয় দলের 'কোরগ্রুপ স্পটলাইট আছেন। ২২ বছরের সুরেন্দার দু'পাশেই খেলতে পারেন। উঠে আক্রমণে সহযোগিতা করেন, আবার বিপক্ষের দ্রুত গতির কাউন্টার অ্যাটাকের সময় একই গতিতে নেমে এসে বিপদ সামলে দিতেও পারেন। এছাড়া দেবাং মুম্বইয়ের ২০ বছরের মিডফিল্ডার নীলকান্ত শর্মা গত বছর হকি ইন্ডিয়া লিগে বিশেষ দর না পেলেও এবছর যা খেলেছেন তাতে তাকেও উপেক্ষা করা যাবে না অলিম্পিকের জন্য। ■

শব্দরূপ-৭৮২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

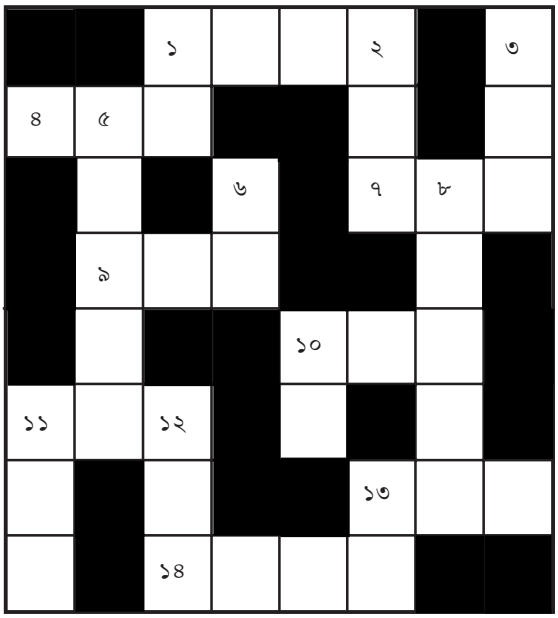

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. প্রাচীন ভারতের সাধুভাষা, **৪.** ইন্দ্র, **৭.** পুষ্ট, সুডৌল, **৯.** যাহা দান করা হয় (‘— ঔষধ, চিকিৎসা’), **১০.** পথ, পদ্ধতি, **১১.** পুত্র; ইন্দ্রের উদ্যান (‘— কানন’), **১৩.** কুবেরপুরী, **১৪.** জৈমিনিভারতে একজন রাজা— ইহার রাণী জনা, পুত্র প্রবীর।

উপর-নীচ : ১. ‘আমার যে—দিতে হবে, সে তো আমি জানি’, **২.** সূর্য, **৩.** ‘মারি তো—, লুঠি তো ভাণ্ডার’ (বাগধারা), **৫.** সৎ-চিৎ- আনন্দ, ব্রহ্মের স্বরূপ, **৬.** গাভীজাত (‘—ঘৃত’), **৮.** ‘ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল/নিম্নে উতলা—’, **১০.** ‘এই লভিনু — তব, সুন্দর, হে সুন্দর’, **১১.** যযাতির পিতা, **১২.** বশিষ্ঠের কামধেনু, সুরভির কন্যা, **১৩.** ছাগল।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	জো	য়া	ল	■	স	ত	র্ক
অ	র	■	■	প্র	তী	প	■
কৃ	ত	কা	র্য	তা	■	■	দ
ত	ল	■	■	প	ঙ্গ	পা	ল
দা	ব	দা	হ	■	■	লা	মা
র	■	■	ব	শ	ং	ব	দ
■	যো	ধ	ন	■	■	দ	ল
ম	গ	ন	■	কু	লা	ল	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

□ ৭৮২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ এপ্রিল ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

প্রকৃত স্বাধীনতার এক পথপ্রদর্শক

রাজা রাজ্য-দেশ জয় করেন, যোদ্ধা দেহ জয় করেন, যোগী করেন দেহ ও মনের বিজয়, সবই ক্ষণস্থায়ী কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব মানবকে শেখালেন পূর্ণ চেতনার জয়। অস্ত্র লাগেনি, লাগেনি হুঙ্কারও। বিনা রক্তপাতে বিপ্লব ঘটালেন তিনি। নাম-বিপ্লব। তাঁর সেই বিপ্লবের তোড়ে ভেসে গেলেন বিধর্মী নবাব হুসেন সাহ, নবদ্বীপের শাসনকর্তা চাঁদকাজী। তাঁরা নিলেন শ্রীচৈতন্যের পরমশরণ। সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যাভিমান, সন্ন্যাসী গুরু প্রকাশানন্দের বৈদান্তিক মত ভেসে গেল ভক্তিবন্যায়। মত্ত জগাই-মাধাই থেকে সুবুদ্ধি রায়, যবন হরিদাস থেকে মহারাজ প্রতাপরুদ্র বুঝলেন প্রেমই পরমার্থ। আবালবৃদ্ধবণিতা মজলেন শ্রীচৈতন্য প্রেমবৃত্তে। আর শ্রীচৈতন্য শোনালেন স্বাধীনতার তাৎপর্য। নিজের সীমাবদ্ধতাকে জয় করে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের বার্তা। পাশাপাশি শেখালেন সাম্যবোধ। প্রকৃত স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।

অর্ধসহস্র বর্ষ আগের তিমিরাবৃত সময়কে আলোর বৃত্তে ফিরিয়ে দেবার

রূপকার একমাত্র শ্রীচৈতন্যই। পীড়নের বিরুদ্ধে তিনি শুধু অহিংসা অথচ সর্বপ্লাবী বিপ্লবই করলেন না, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি বিতরণ করলেন 'প্রেম'। নিঃস্বার্থ প্রেম। প্রেমকে করলেন মন্ত্র। প্রেমমন্ত্রের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা দিলেন দয়ায়। নিত্য-সত্য-পরম দয়া। পরোপকারের তুমুল জোয়ারে পৃথিবীকে অবগাহিত করার জন্য জানালেন অন্তরতম আহ্বান।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার।।"

প্রেম ও দয়ার পাশাপাশি পৃথিবীবাসীকে ভক্তিরসে জারিত করতে মুখে যোগালেন নাম। হরিনাম সংকীর্তন করে বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে বাঁধতে চাইলেন প্রেমডোরে। আত্মস্বরূপ বিস্মৃত, জাগতিক মোহে মোহাবিষ্ট, স্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন, কলহপ্রবণ জাতির সামনে তুলে ধরলেন প্রেম, সম্প্রীতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের অমোঘ ও অমরবাণী। বিশ্ব ভাসালেন নামানন্দের ভেলায়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামসঙ্কীর্তনই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের অন্যতম পথ।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক সুন্দর পালের বড় দাদা শঙ্কর পাল গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। স্ত্রী, দুই ছেলে, বউমা, নাতি-নাতনিদের তিনি রেখে গেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

***

সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক এবং ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রাক্তন কার্যকর্তা শিউপ্রসাদ সিং-য়ের ধর্মপত্নী শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী গত ৭ মার্চ মহাশিব রাত্রির পুণ্য তিথিতে ৭২ বছর বয়সে স্বগৃহে পরলোকগমন করেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে ভুগছিলেন। স্বামী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা-সহ দুই পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের তিনি রেখে গেছেন। তিনি সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্ঘ কার্যে সক্রিয় যোগদানের জন্য উৎসাহিত এবং সহায়তা করতেন।

শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের হস্তলিপি

শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের হস্তলিপির এই ফটোকপি বর্ধমান জেলার দেনুর থেকে সংগৃহীত। দেনুর মেমারী থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দেনুরে চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর শ্রীপাঠ আছে। বৃন্দাবন দাস বিবাহ করেননি। তাঁর শিষ্য নরহরি ভট্টাচার্যের বংশধরের কাছে এই হস্তলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে। এছাড়াও মহাপ্রভুর হস্তলিপি নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গের সেবায়েত—

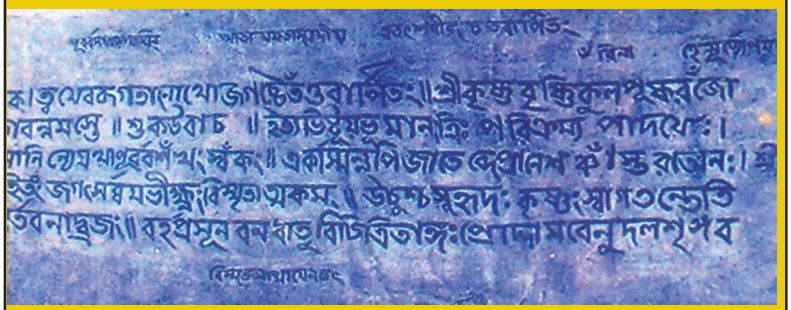

নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামী; অম্বিকা কালনায় অবস্থিত মহাপ্রভুর সমসাময়িক গৌরিদাস পণ্ডিতের বংশধর শ্রী তাপস গোস্বামীর কাছেও হস্তলিপি আছে (ফটো তোলা নিষিদ্ধ)। কলকাতার বরাহনগরে অবস্থিত পাঠবাড়ির লাইব্রেরিতে মহাপ্রভুর হস্তলিপি রক্ষিত আছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অধিকাংশ অক্ষর মুছে গিয়েছে। শোনা যায়, তমলুকে বাসুদেব ঘোষের শ্রীপাটে, বারুইপুরে অনন্ত আচার্যের শ্রীপাটে এবং খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দিরের নিকটে নিত্যানন্দের বংশধরের কাছেও থাকতে পারে।

সৌজন্যে ঃ ছবি ও লেখা : সুজিত কুমার দাস

আহমদ রফিক রচিত
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা বাঙালী ও বাংলাদেশী ২০০
এই অস্থির সময় ১৭৫
নির্মল ঘোষ রচিত
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংশয় ও স্বপ্নে ১৫০
লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা রচিত
মূল নারায়ণ চরিত
গোপালকৃষ্ণ রায় রচিত
জনজাতির জীবনকাব্য হরিলক্ষ্মীর আত্মকথা (উপন্যাস) ১৫০
এই নারী দেহ (উপন্যাস) ১৫০
শেখর সেনগুপ্ত রচিত
কেমন করে মানুষ ওড়ে ১২৫
সকালবেলার বিলে ২০০
ময়লা হাতের থাবা ৮০
কালাচাঁদ রায় রচিত
মোহনায় দেখা ৮০
ভালবাসা থেকে যায় ২০০
সিদ্ধার্থ সিংহ রচিত
তৃতীয় চোখ ৭৫
নামগোত্রহীন (উপন্যাস) ৩০০
ড. বিজয় আঢ্য রচিত
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে ২০০
প্রদীপ ঘোষ রচিত
লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য ১৫০
সৌরকুমার বসু রচিত
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আমল ২০০
শতরূপা সান্যাল রচিত
অনন্যা অন্যান্য ১৫০
সোয়াডজন ছড়া ১০০
ছড়ানো ছিটোনো ১০০
অঞ্জলী দত্ত রচিত
সুরমঞ্জরী ৩০০
সুরের ধারায় বিবর্তন ৮০
অঞ্জুশ্রী চন্দ্র রচিত
কভু স্বদেশে কভু বিদেশে ১২৫
ড. নবনীতা বসু হক রচিত
রবীন্দ্রনাথ : নারী সমাজ অর্থনীতি ১৫০
প্রেম কাম এবং ১৫০
আলপনা ঘোষাল রচিত
ত্রিলোকেশ্বর (উপন্যাস) ৩৫০
ভীমনারায়ণ মিত্র রচিত
পশুপাখিদের অধিকার বনাম মানুষের নৃশংসতা ৩০০
পশুক্লেশমোচন মহানধর্ম ১৫০
ড. চিররঞ্জন পোদ্দার রচিত
ফিরে ফিরে দেখি ১০০
জীবনীকার মণি বাগচি রচিত
কথামৃত সার ২০০

আসন্নপ্রকাশ

শেখর সেনগুপ্ত রচিত
ঋষি অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ন ৩৫০ (প্রতি খণ্ড)
ড. বিজয় আঢ্য রচিত
স্বদেশ ও সমাজভাবনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৫০
ড. মণিমোহন ভট্টাচার্য রচিত
স্বামীজী পুত্র নেতাজী ৩৫০
সুনীল দাস রচিত
চারটি রহস্য উপন্যাস ২৫০
হরিবংশ রাইবচ্চন, অনুবাদ : সুমিতা ভৌমিক
মধুশালা ১০০
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
আপনি কি ১০০% সুস্থ??? ২০০
Dr. Subhrendu Bhattacharya
Affinity between Blake's views and Indian Philosophy INR : 500

অর্পণ
একটি মননশীল পত্রিকা
arpansahityapatrika@gmail.com
সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহক মূল্য ২০০
আপনার মূল্যবান লেখাটি পাঠান মনোনীত হলে আমরা প্রকাশ করব।
আমাদের বই Amazon.com এ পাওয়া যাচ্ছে
সম্পাদক : প্রদীপ ঘোষ
মোবাইল : 9874327222

প্রিটোনিয়া
পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্
১৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯
ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com
visit: www.pritoniapublishers.com

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
21 March - 2016 - Rs. 10.00

मध्यप्रदेश लगातार
11वीं बार विजेता

सीनियर राष्ट्रीय कराते चैम्पियनशिप-2016 केरल में
मध्यप्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी के खिलाड़ी सर्वाधिक
8 पदकों के साथ रहे सबसे आगे।

बधाई

क्र.	खिलाड़ी	वर्ग	पदक
1.	सुप्रिया जाटव	55 कि.ग्रा. कुमिते	स्वर्ण
2.	शिवानी कराले	68 कि.ग्रा. व्यक्तिगत कुमिते	स्वर्ण
3.	सुप्रिया जाटव, शिवानी कराले	टीम कुमिते (महिला)	स्वर्ण
4.	सुमन थापा, प्रिया गुरंग, नेहा गिरी	टीम काता (महिला)	स्वर्ण
5.	विकी शैजुल	50 कि.ग्रा. व्यक्तिगत कुमिते	रजत
6.	कुलदीप कांडिल	75 कि.ग्रा. व्यक्तिगत कुमिते	रजत
8.	सत्यम शर्मा	टीम काता (पुरूष)	कांस्य
9.	पलाश समाधिया, सत्यम शर्मा, राहुल शुक्ला	टीम काता (पुरूष)	कांस्य

शिहान जयदेव शर्मा – टीम कोच, मध्यप्रदेश

खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश

खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

दाम : १०.०० टाका